উপন্যাস

অঙ্কন : রাশিদুল আলম মানিক

মাঙ্কি

মঈনুল আহসান সাবের

মাঙ্কি, তুমি এই দিকে আসো।
দেয়ালের ওপর উঠে বসে ছিল মাঙ্কি। দড়ি বাবুলের ডাক শুনে সে ফিরে তাকিয়ে খুশিতে সব দাঁত মেলে দিল।

আসো মাঙ্কি।

মাঙ্কি সজোরে দুই দিকে মাথা নাড়ল।

দড়ি বাবুল তাকে আর ডাকল না। বারান্দায় মাদুর পাতা ছিল। দড়ি বাবুল সেখানে বসে পড়ল। তার মন ভালো নেই। ঘুম ভাঙার কিছুক্ষণ আগে সে একটা ভয়ংকর স্বপ্ন দেখেছে। একটা অজগর বিশাল হাঁ করেছে, আর তার মাথা ঢুকে গেছে অজগরের সেই হাঁ-করা মুখের ভেতর। অজগর তাকে গিলতে শুরু করেছে। প্রায় বুক পর্যন্ত গিলেছে, তারপর অজগর নিশ্চুপ। সেই অবস্থায়ও

সে টের পাচ্ছে, অজগরটা আসলে নিশ্চুপ না, অজগরটা আসলে তাকে গিলতে চাইছে, কিন্তু পারছে না। কী আশ্চর্য কথা, বুক পর্যন্ত অজগরের ভেতর ঢুকে পড়ায় সে অবাক, তার দড়ির মতো হালকা-পাতলা শরীর, সেই থেকে তার নাম দড়ি বাবুল, অজগরটা তাকে গিলতে পারছে না কেন!

ওই অবস্থায় তার ঘুম ভেঙে গেল। সে টের পেল, তার সারা শরীর ঘামে সপসপ করছে। সে বিরক্ত বোধ করল, অমন একটা বিদঘুটে স্বপ্ন দেখতেই বা হবে কেন, শরীরই বা কেন এত ঘামবে! তারপর প্রায় দেড় ঘণ্টা পার হয়েছে। দড়ি বাবুল খুবই অবাক হয়ে দেখছে, অজগরটা তাকে বুক পর্যন্ত গিলে ফেলেছে, এই দৃশ্য সে কিছুতেই চোখের সামনে থেকে সরাতে পারছে না।

কাজ করে দেওয়ার জন্য একটা লোক আছে। নাম বসন্ত। সম্ভবত ছোটবেলায় অন্য কোনো নাম ছিল, বসন্ত হয়ে চোখে-মুখে দাগ হয়ে যাওয়ার পর বোধ হয় তাকে সবাই বসন্ত বসন্ত বলে ডাকতে শুরু করেছে। সেই থেকে তার নামও হয়ে গেছে বসন্ত। দড়ি বাবুলের মাঝেমধ্যে মনে হয়, সে জিজ্ঞেস করবে, তার ধারণা ঠিক কি না। জিজ্ঞেস করা হয়ে ওঠে না। কখনো জিজ্ঞেস করার ইচ্ছা হলে তার মনে হয়—কী দরকার, এর নাম বসন্ত হোক কিংবা ওলা ওঠা, তার কী!

বসন্ত তার পাশে বিস্কুট আর চা নামিয়ে রাখল। দূর থেকে সেই দৃশ্য দেখে মাঙ্কি উৎসুক হয়ে উঠল। বসন্ত জিজ্ঞেস করল—বান্দরকে খাবার দিব? কলা?

কী বললা?

বান্দরকে কলা দিব?

ওরে বান্দর বলতেছ কেন? ওর নাম নাই? আমি কি তোমাকে কলেরা বলি?

নাম।

ওর নাম ধইরা বলো।

মাঙ্কিরে খাবার দিব?

ওরে জিজ্ঞেস করো।

বসন্ত মুখ ফেরাল মাঙ্কির দিকে—মাঙ্কি, আসো, কলা খায়া যাও।

মাঙ্কি প্রায় উড়ে এসে দড়ি বাবুলকে প্রায় জড়িয়ে ধরল। দড়ি বাবুল বসন্তকে বলল—আর কুনো দিন যদি ওরে বান্দর বলছ, ওর সঙ্গে তোমার কোর্ট ম্যারেজ করায়া দিব।

বসন্তের পকেটে কলা ছিল। সেটা সে বের করামাত্র মাঙ্কি ছিনিয়ে নিল। দড়ি বাবুল বলল—বসন্ত, তুমি যাও, না ডাকলে আসবা না। আমি আর মাঙ্কি এখন খেলব। মাঙ্কি, খেলবি?

মাঙ্কি বলল—চিই-ই।

কী খেলবি, মাঙ্কি-মাঙ্কি খেলবি?

মাঙ্কি সজোরে মাথা দোলাল।

দড়ি বাবুল হাসল—এই খেলা তোর খুব পছন্দ?

মাঙ্কি মাথা ঝাঁকাল, বলল—চিই-ই।

এই খেলা সবারই খুব পছন্দ। কেউ বাদ যায় না, সবাই খেলে।

মাঙ্কি দাঁত মেলে দিল।

তবে সবাই বুইঝা খেলে, এইটা না। কেউ বুইঝা খেলে, কেউ না বুইঝা খেলে।

মাঙ্কি কিছু বলল না। সে কলা খেতে ব্যস্ত।

দড়ি বাবুল গভীর মমতা নিয়ে মাঙ্কির দিকে তাকিয়ে থাকল। মাঙ্কির কলা খাওয়া শেষ হলে মাঙ্কিও তাকাল। যেন খুব সহজেই সে দড়ি বাবুলের চোখের ভাষা পড়তে পারল। সেও তাকিয়ে থাকল দড়ি বাবুলের দিকে।

তোরে একটা কথা বলব? তুই কি রাগ করবি?

মাঙ্কি তাকিয়ে থাকল।

তোরে আমি ছাইড়া আসব। আমি যাব না। কাউরে দিয়া পাঠাব। তুই আর ফিরবি না। রাজি?

মাঙ্কি হাসল।

হাসিস না, উপায় নাই।

মাঙ্কি আবারও হাসল।

তোর কী ধারণা, উপায় থাকলে আমি তোরে বিদায় করতাম। কিন্তু জায়গামতো খবর পৌঁছায়া গেছে, দড়ি বাবুলরে পাইতে হইলে আগে মাঙ্কিরে খুঁইজা বাইর করো।

মাঙ্কি বলল—চিই-ই।

উপায় নাই।... ফিরবি না, বুঝছস। ফিরলে...।

দড়ি বাবুল কথা শেষ করতে পারল না, তার মোবাইল ফোন বেজে উঠল। দড়ি বাবুল ধরল না, ফোন বাজতেই লাগল, শেষে সে ফোন হাতে তুলতে বাধ্য হলো এবং স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে জিভ কাটল—করছি কী! আম্মার ফোন ধরতেছি না। সে কল রিসিভ করল, কিছুক্ষণ ধরে 'জি আম্মা', 'জি আম্মা', 'অবশ্যই আম্মা', 'আপনারা ভাববেন না আম্মা, দড়ি থাকতে আপনের চিন্তা নাই' বলে গেল। ফোন নামিয়ে রেখে সে মাঙ্কির দিকে ফিরল—কী যেন বলতেছিলাম?... হ, তুই ফিরবি না। তোর মতোন থাকবি। এই দুনিয়া এই রকম, যার যার মতোন না থাকলে অসুবিধা।... মাঙ্কি। দড়ি বাবুল ক্লান্ত গলায় বলল—তোরে আমি কী যে ভালোবাসি! কিন্তু তুই ফিরলে আমি এমুন মাঙ্কি মাঙ্কি খেলা দিমু! বলতে বলতে দড়ি বাবুল কোমরে গুঁজে রাখা পিস্তল বের করে মাঙ্কির দিকে হাসিমুখে তাক করল।

নাদিরা বেগমের ঘুম ভাঙল দেরিতে। সচরাচর এ রকম হয় না। ফজরের আজান পড়ে, নাদিরা বেগমের ঘুম ভাঙে, এ রকম হয়ে আসছে বহুদিন হলো। দেরি করে ঘুম ভাঙার কারণে তার মনটা ভার হয়ে থাকল; যদিও সে নিজে বুঝল না। একদিন দেরি করে ঘুম ভাঙার কারণে মন ভার হওয়াটা অযৌক্তিক। দুই ঘণ্টা দেরিতে ঘুম ভেঙেছে বলে কোথাও কিছুই এসে যায়নি। তার ধারণা, কিছুতেই আসলে কিছু এসে যায় না। তবে মন ভার হয়ে থাকার আসলে আরো কারণ আছে, দেরি করে ঘুম ভাঙাটা একটা অজুহাত।

কিছু ঝামেলা শুরু হয়েছে কয়েক দিন হলো। তিনটা দোকান আছে তার, ভাড়া দেওয়া। হঠাৎ মাস তিনেক আগে তিন দোকানই একসঙ্গে ভাড়া দেওয়া বন্ধ করে দিল। এক মাস গেল, সে কিছু বলল না। দুই মাস গেল, সে কিছু বলল না, তৃতীয় মাসের শুরুতে সে লোক পাঠিয়ে ভাড়াটিয়া তিনজনকে ডেকে পাঠাল। তারা এল না। দ্বিতীয়বার ডেকে পাঠালেও তারা এল না। তখন নাদিরা বেগম নিজেই হাজির হলো দোকানে—আপনাদের ব্যাপার জানতে আসলাম।

তিন দোকানিই গাঁইগুঁই করল, ব্যবসা খারাপের কথা বলল, চাঁদাবাজদের কথা বলল; কিন্তু সে থাকল অনড়। অনড় থাকল বলেই সে দুই মাসের ভাড়া আদায় করে আনতে পারল। তবু মনটা আসলে তার সেই থেকেই খারাপ। সে বুঝতে পারছে, এ রকম ঝামেলায় তাকে আরো পড়তে হবে। হয়তো একদিন দেখা যাবে দোকানিরা মালিকানাই দাবি করে বসেছে, কিংবা অন্য কেউ মালিক সেজে এসেছে। নাদিরা বেগম জানে, এসব সে হয়তো সামাল দিতে পারবে। হয়তো হৈচৈ হবে, হয়তো দৌড়াদৌড়ি হবে; কিন্তু সে সামাল দিতে পারবে। কথা হচ্ছে, এসবই ঝামেলা। ঝামেলা অনেক পার করেছে সে, ঝামেলা তার আর ভালো লাগে না। বিছানা থেকে নামতে নামতে নাদিরা বেগম একটু হাসল—ঝামেলা আর ভালো লাগে না, এ রকম ভাবছে কেন সে! ঝামেলা কি কখনো ভালো লাগার ব্যাপার!

এ রকম ভাবতে গিয়ে নাদিরা বেগম থমকে দাঁড়াল। না, ঝামেলা ভালো লাগার ব্যাপার না; কিন্তু জিদ, জিদ সে পছন্দ করে। জিদ পছন্দ করে বলেই সে কামরুলকে বলতে পেরেছিল—এইটা নিয়া তুমি ভাববা না, কামরুল। এইটা নিয়া তোমার ভাবার দরকার দেখতেছি না।

আমি দরকার দেখতেছি। তোমারে এই ঝামেলায় আমি ফেলছি।

আমার সায় না থাকলে তুমি ফেলতে পারতা না।

সেইটা কথা না।

কথা কোনটা?

তুমি ঝামেলা নিতেছ।

নিতেছি।

নাদিরা, মাইয়া মানুষের এত জিদ ভালো না।

সেইটা আমারে বুঝতে দাও। তুমি পলাইতে ভালোবাসো, তুমি পলাও।

এইটা কী বলো তুমি—আমি পলাইতে ভালোবাসি।

দেখতেছি তো।

তুমি কি একবারও ভাইবা দেখছ—এইটা কি সম্ভব?
কামরুল, আসো, এক কাজ করি। তোমার বুঝ নিয়া তুমি থাকো, আমার বুঝ নিয়া আমারে থাকতে দাও।
নিজের বুঝ নিয়ে নাদিরা বেগম থেকেছে। কত ঝক্কি, কত ঝামেলা, কত গ্লানি, কত বিপদ; কিন্তু সরে আসেনি সে, হারও মেনে নেয়নি। আসলে ওই সময়ই একটা ভয়ংকর রকম জিদ তার ভেতরে তৈরি হয়ে গেছে। হয়তো একটু জিদি ছিলই সে। ওই ঘটনায় জিদ তার শক্ত হয়েছে। তারপর তার ভেতর থেকে গেছে। জিদের কারণে তার কখনো এ রকম মনে হয় অবশ্য, ক্ষতি হয়েছে তার, মনে হয়েছে—এই জিদটা না থাকলে জীবন অন্য রকম হতে পারত, অনেক সোজা ও সরল। তবে ওই মনে হওয়া পর্যন্ত, যে জীবন সে জিদ ধরে পার করে এসেছে ও পার করছে, সে জীবন নিয়ে তার সামান্য ক্ষোভ নেই। যদি থাকে কিছু, সে জানে, সন্তুষ্টিই আছে।
নাদিরা বেগম গোসল সেরে নিল, পোশাক পাল্টাল, বারান্দায় এসে বসল। এ বাড়িটা পুরনো, এখানে-ওখানে নড়বড়ে হয়ে গেছে। বেশ কিছু মেরামতের কাজ জমে আছে, করাতে হবে। এ কাজগুলো অবশ্য কায়সারই করতে পারে। কায়সার নিজেই বলে সে কথা—আম্মা, তুমি কি আমারে বড় হইতে দিবা না?
বড় তো হইছস।
হইলাম আর কই! দেখি তো, কুনো দরকার পড়লেই বাইরে থেইকা লোক ডাইকা আনো।
তোর কী ধারণা, এই কাজগুলো তুই করতে পারবি?
আশ্চর্য কথা বলো! পারব না ক্যান?
ব্যস, হইল।
কী হইল?
আমার জানা হইল—তুই পারবি।
এরপর আমারে বলবা তো?
বাপ আমার, আমার জানা থাকল—তুমি পারবা—এইটাই কি যথেষ্ট না?
কায়সারের কাছে তার চাওয়া আসলে একটাই। সেটা সে কায়সারকে মনে করিয়ে দেয় প্রায়ই—তোমার পড়াশোনা কেমন হইতেছে বাপ?
নাদিরা বেগম জানে, কায়সারের লেখাপড়া ভালো হচ্ছে। তার অনার্সের রেজাল্ট ভালো হয়েছে, অত সে বোঝে না, কায়সারের মুখে শুনেই বুঝেছে, সামনে তার আরেকটা পরীক্ষা। কায়সার তাকে জানিয়েছে চিন্তা না করতে, এই পরীক্ষাও তার ভালো হবে। কায়সারের মাথা ভালো, সে জানে, খুব বেশি লেখাপড়া তার করতে হয় না। কায়সারের মাথা ভালো নাও হতে পারত। তার নিজের লেখাপড়ার মাথা ভালো না, স্কুলে আর কলেজের সময়গুলো ছিল বিরক্তিকর। কায়সারের বাবার মাথাও ভালো ছিল না, কলেজ পর্যন্ত বোধ হয় গিয়েছিল—এটুকুই। সুতরাং কায়সারের লেখাপড়ার মাথা ভালো না হলেও কিছু বলার ছিল না। হয়েছে, ছেলে রেজাল্ট ভালো করছে, আরো করবে, দেখবে সবাই—নাদিরা বেগম জানে, এটাও তার জিদ। হয়তো তার সব জিদের মধ্যে এটাই সবচেয়ে কঠিন জিদ।
নাদিরা বেগম বারান্দা ছেড়ে উঠল। এখন সে নিজ হাতে দুই কাপ চা বানাবে। কায়সারকে দেবে এক কাপ, আর তার নিজের জন্য এক কাপ। চা খেতে খেতে সে ছেলের সঙ্গে গল্প করবে। এই যে চা খেতে খেতে ছেলের সঙ্গে গল্প করা, নাদিরা বেগমের মনে হয়, এর চেয়ে আনন্দের সময় আর কিছুই না।
দড়ি বাবুল এসেছে, খবর পৌঁছাল নাদিরা বেগমের কাছে। তাকে চা-নাশতা দিতে বলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল নাদিরা। দড়িকে নিয়ে কিছু সমস্যা আছে। নাদিরা বেগমের সামনে কোনো কাজই সে সহজভাবে করতে পারে না। দেখা গেল তারা দুজন কথা বলছে, চা-বিস্কুট এল, বহু বলার পরও দড়ি কিছুই মুখে তুলতে পারল না। এ নিয়ে প্রথম প্রথম কথা হয়েছে—এইটা কী দড়ি! আমি তোমারে বিস্কুট নিতে বলতেছি, তুমি নিতেছ না।
আম্মা, আমি এইটা পারব না।
নাও বলতেছি।
আম্মা, আপনে বললে সব পারি, এইটা বলবেন না।
দড়ির আরো কিছু ব্যাপার আছে। নাদিরা বেগম না যাওয়া পর্যন্ত সে দাঁড়িয়ে থাকবে।
নাদিরা বেগম যাবে, বসবে, দড়িকে বসতে বলবে, তারপর সে বসবে, তবে তাকে বসতে না বললে সে আরো খুশি। প্রথম প্রথম বসতও না সে। নাদিরা বেগম প্রায়ই খুব বিরক্ত হতো—বসতেছ না ক্যান!
আম্মা, আমি আপনার সামনে বসতে পারব না।
আমি বইসা কথা বলব আর তুমি দাঁড়ায়া থাকবা?
জি। আপনে বলেন। কুনো অসুবিধা তো হইতেছে না।
অসুবিধা আর কী! তুমি হইতেছ সমস্যা, এই যা ব্যাপার।
জি।
দড়ি তারই বয়সী, বেশি হলে বছর দুয়েকের ছোট হতে পারে। কিন্তু তাকে সেই প্রথম থেকে আম্মা ডেকে আসছে। নাদিরা বেগমের খেয়াল আছে, প্রথম প্রথম কিছুই বলত না দড়ি, কামরুলের সঙ্গে তার যখন সম্পর্ক, তবে সমীহ করত। তারপর কায়সার যখন পেটে, কামরুল চাইল ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে, সে চাইল না, আর কামরুল সরে গেল। সে দেখল, দড়ি নিয়মিত তার খোঁজখবর নিচ্ছে। দড়ি সম্পর্কে শুনেছিল সে, কামরুল বলেছিল, এ রকম বিশ্বস্ত লোক পাওয়া যায় না, এত নির্বিকারভাবে খুন করার মানুষও পাওয়া যায় না। দেখতে ওই রকম, হালকা-পাতলা, ছোটখাটো। এতটাই হালকা-পাতলা যে তার নাম বাবুলের জায়গায় দড়ি বাবুল হয়ে গেছে; কিন্তু সাহস নাকি বাঘের মতো, আর শরীরে যে শক্তি কম, সেটা সে পুষিয়ে নেয় বুদ্ধি দিয়ে।
দড়ি তাকে আম্মা বলে ডাকল কায়সার জন্মানোর পর। নাদিরা বেগম অবাক গলায় জিজ্ঞেস করল—কী বললা?
আম্মা।
আমি তোমার আম্মা!
দড়ি চুপ করে থাকল।
আমার যে পোলা হইছে, সে তোমার ভাই?
দড়ি চুপ করে থাকল।
চুপ কইরা আছ ক্যান! তুমি কবে থেইকা পোলা হইছ আমার!
দড়ি বলল—আম্মা, আপনে চিন্তা করবেন না। আমি আছি।
দড়ি তার কথা রেখেছে। সে থেকেছে। কামরুল তার খোঁজ নেয়নি, কিছু বিষয়-সম্পত্তি লিখে দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলেছে; কিন্তু দড়ি এসেছে, খোঁজ নিয়েছে, ঝামেলা আছে নাকি কোনো—জানতে চেয়েছে। মাঝেমধ্যে মনে হয়েছে নাদিরা বেগমের, দড়িকে কামরুল পাঠায়। তার মনে হয়েছে, কামরুল নিজে আসতে পারে না বা চায় না, দড়িকে পাঠায় সে। কিছুদিন পর সে বুঝতে পেরেছে, তার এই ধারণাটা ঠিক না। কামরুল পাঠায় না, দড়ি নিজেই আসে। দড়ি নিজেই আসে—এটা বুঝতে পেরে অদ্ভুত এক মমতা জন্মেছে তার প্রতি। আর কামরুল যে পাঠায় না—এটা বুঝতে পেরে একটু মন খারাপ সে সময় হয়েছে, তবে সেটা সে ঝেড়ে ফেলতে পেরেছে। সে তো তার জীবন ঠিক করেই নিয়েছে, ঠিক করে নেওয়া জীবনে মন খারাপের কিছু থাকতে পারে না।
দড়ির চা-নাশতা পর্ব শেষ হয়েছে অনুমান করে নাদিরা বেগম উঠল। দড়ি যথারীতি দাঁড়িয়ে ছিল, জানালার পাশে। নাদিরা বেগমের পায়ের শব্দে ফিরে তাকিয়ে সালাম দিল সে।
তোমার খবর ভালো?
জি, আম্মা।
বসো। এইবার আমার খবর দাও।
সাভারে পাঁচ শতক জায়গা আছে নাদিরা বেগমের নামে। বহু আগে কামরুল লিখে দিয়েছিল। তখনো দামি জায়গা ছিল ওটা, এখন দাম আকাশ ছুঁয়েছে। সেই জমি নিয়ে ঝামেলা হয়েছে। ঝামেলা অবশ্য আগেও হয়েছে। সামাল দিয়েছে দড়ি। গত কয়েক বছর হলো ঝামেলা লেগেই আছে। এ মালিকানা দাবি করে, ও সাইনবোর্ড টাঙায়—ক্রয় সূত্রে এ জমির মালিক। কেউ আবার দেয়াল দিয়ে ঘিরে ফেলে, আবার কেউ তার পাশের জমির সঙ্গে এ জমি মিশিয়ে ফেলতে চায়। এসবও দড়িই সামাল দিয়েছে। আবার নতুন ঝামেলা শুরু

হয়েছে, দড়িকে খবর দেওয়া হয়েছে, দড়ি খোঁজ নিয়ে জানিয়েছে এবারের ঝামেলা বড়। এ কথাই আবার নতুন করে জানাল দড়ি।

তুমি এইবার আর সামাল দিতে পারবা না, না?

আম্মা, আমি সেই কথা বলি নাই।

তোমার বলার ধরন দেইখা মনে হইতেছে।

আম্মা, আপনে বললে আমি...।

নাদিরা বেগম হাসল—আমি বললে তুমি পারো, এইটা আমি জানি।

সমস্যা হইল নতুন নতুন চেহারা উইঠা আসতেছে। যেই মুখ পুরান, যেই মুখ চিনি, সেই মুখ নিয়া সমস্যা নাই।... সমস্যা নতুন মুখ নিয়া।

নাদিরা বেগম মাথা সামান্য ঝাঁকাল।

আমি কি একটা কথা বলব, আম্মা?

বলো।...না, বলবা না। কামরুলের হেল্প আমি নিব না।

উনার অনেক ক্ষমতা। এখন উনি রাজনীতিও করতেছেন।

সে জাহান্নামে যাউক। তুমি অন্য ব্যবস্থা করো।

বলেন।

ওই জমি বিক্রির ব্যবস্থা করো। এইটা পারবা?

জি।

করো তাইলে! আমার ইচ্ছা ছিল অন্য রকম।

নাদিরা বেগমের কী ইচ্ছা ছিল, সেটা জানার জন্য দড়ি বাবুল তার দিকে তাকিয়ে থাকল।

ভাবছিলাম কায়সারের বিবাহের সময় তারে ওই জমি লিখে দিব।

আম্মা, রাখার দরকার নাই। বিক্রি কইরা দ্যান। ট্যাকা ব্যাংকে রাখেন। বিবাহের সময় ওই ট্যাকা তারে দিয়া দিবেন।

তুমি বিক্রির ব্যবস্থা করো। তুমিও যখন ভরসা পাচ্ছ না, ওই জমি রাখনের দরকার নাই।

জি, করব।...আম্মা, ভাইয়া কি বাসায়?

নাদিরা বেগম কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল, সামান্য হাসল—বাবুল, তুমি আমার জন্য অনেক করছ, তোমার মতো বিশ্বাসী লোক আমি দেখি নাই, পাওন তো দূরের কথা। তবু মাঝে মাঝে একটা ব্যাপার নিয়া আমি ডরাই, এইটা কি তুমি জানো?

কিছুটা সময় শিশুর মতো নাদিরা বেগমের দিকে তাকিয়ে থাকল দড়ি বাবুল। তারপর সে হাসতে শুরু করল।

আমার ডরের কথা শুইনা তুমি হাসতেছ?

আম্মা, আপনে জানেন, ভাইয়া কুনো দিনই জানব না।

জানি।

জানলে সেই কবেই জানতে পারত। জানে নাই, কুনো দিন জানবও না। আপনি ভাববেন না।

নাদিরা বেগম অন্য মনস্ক ভঙ্গিতে হাসল—ভাবতে চাই না, তবু এই ভাবনা আসে।...দড়ি, তুমি বুঝবা না। এই ডর আমারে ছাইড়া যাইতে চায় না।

নাজিয়া সম্পর্কে কিছু ধারণা কায়সারের কাছ থেকে পাওয়া ছিল। এই একটি মেয়ের কথাই গত দুই বছর হলো বলছে কায়সার। আর বলার ধরন দেখলেই বোঝা যায় দুজনের সম্পর্কটা কোন পর্যায়ের। নিজে থেকে উৎসাহ নাদিরা বেগম কোনো সময়ই দেখায়নি। বরং যখন নাজিয়ার কথা শুনেছে সে, দুজনের বাড়তি সম্পর্কের ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে, তার ভেতরে একটা ভয় শুরু হয়েছে। ভয়টা সে কায়সারকে বুঝতে দেয়নি। বুঝতে পারলে কায়সার কষ্ট পাবে, ভাববে, মা এমন একটা অদ্ভুত ভাবনা নিয়ে আছে! হয়তো অদ্ভুতই তার ভাবনা, হয়তো অদ্ভুত, কিন্তু হোক অদ্ভুত। সে যে ভয়টা এড়াতে পারে না, কথা মিথ্যা না।

নাজিয়া নামের মেয়েটার জন্য কায়সারের টান, কায়সারের মুখ থেকে শোনা কিছু কিছু কথা—এসব নাদিরা বেগমকে এমন একটা ভয়ের ভেতর ফেলে দিয়েছে—তাহলে কি কিছুদিন পর কায়সার তার কাছ থেকে দূরে চলে যাবে? অন্য একটা মেয়ের কাছে? কায়সার যদি তার কাছ থেকে দূরে চলে যায়, তবে বসে থাকবে কী করে!

নাদিরা বেগম আসলে এই ব্যাপারটা গুছিয়ে ভাবতে পারে না। ধরা যাক, বিয়ে হলো ওদের দুজনের, তারা বিয়ের পর অন্য কোথাও উঠে গেল না, তারা এ বাসায় থাকল। কিন্তু এ বাসায় থাকা মানেই কায়সারের তার কাছে থাকা না, যেমন দূরে কোথাও চলে যাওয়া মানেই সব সময় দূরে যাওয়া নয়। খুব কাছে, পাশের ঘরে থেকেও অনেক দূরে থাকা যায়।

এত ভয়ের ভেতরেও নাজিয়া নামের মেয়েটাকে দেখে নাদিরা বেগমের মন ভরে গেল। কিছু কিছু চেহারা থাকে, দেখলেই শান্তি তৈরি হয়। মেয়েটার চেহারা ও রকম, আর কী সে মায়া মেয়েটার ভেতর! নাদিরা বেগম মেয়েটার একদম সামনে গিয়ে দাঁড়াল, হাসল, জিজ্ঞেস করল—তোমার নাম কী, মা?

কী নাম তা না বলে মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসি সামলাতে সামলাতে বলল—আপনি কিছু মনে করবেন না খালা, আমি একটু বেশি হাসি।

সেইটা তো দেখলাম। হাসলা ক্যান!

হাসলাম, কারণ আপনি আমার নাম জানেন। কায়সার বলেনি আপনাকে?

বলেছে।

মেয়েটি এবার সামান্য হাসল—আমার নাম নাজিয়া। আপনি কি একটা ব্যাপার খেয়াল করেছেন? আপনার নামের সঙ্গে আমার নামের অনেক মিল!

তুমি আমার নাম জানো?

জানব না কেন, কায়সার বলেছে না! প্রথম দিনই বলল, তোমার নাম আর আমার মায়ের নাম প্রায় এক।

নাদিরা বেগম হাসল—বসো মা, তোমরা গল্প করো।

আপনি বসেন।

তোমরা বসো...।

আমি আপনার সঙ্গে গল্প করতে এসেছি। কায়সারের সঙ্গে গল্প আমার হয়ই।

বসলাম।...থাকো কোথায় মা?

গুলশানে।

বাবা কী করেন?

ব্যবসা।

মা কিছু করেন?

জি, করেন। বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করেন আর আড্ডা দেন।

নাদিরা বেগম হেসে ফেলল—এইভাবে বলে না মা।

খালা, আমি কি একটা কথা বলব?

বলো।

কায়সার যা বলেছিল, আপনি তার চেয়ে অনেক সুন্দর।

আর তুমি যে কত সুন্দর সেইটা কি তুমি জানো?

নাজিয়া দুই পাশে মাথা নাড়ল, জানে না সে।

জানো না?

জি, না। আপনি একটু বলেন না।

নাদিরা বেগম নাজিয়ার দিকে তাকাল। দেখল, মেয়েটির মুখ চাপা হাসিতে ভরে আছে। তার দিকে তাকিয়েই থাকল নাদিরা বেগম। তার মনে হলো, এ রকম একটা মেয়ে সারা বাড়ি আলো করে রাখতে পারে।

মেয়েটি বিদায় নিল বিকেলের আগে আগে। কায়সারও বের হলো তার সঙ্গে। মেয়েটির সঙ্গে গাড়ি আছে। সুতরাং তাকে পৌঁছে দিতে হবে না। কায়সার বের হলো তাকে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য। তারপর তার অন্য কাজ আছে। সে বলে গেল, কাজ সেরে ফিরতে তার কিছু সময় লাগবে। দেরি বেশি হলে নাদিরা বেগম যেন খেয়ে নেয়।

কায়সারের ফিরতে রাত কিছু হলো বটে, নাদিরা বেগম খেলো না। কিছু কথা কায়সারকে বলা দরকার, এটা তার অনেকক্ষণ থেকেই মনে হচ্ছে। আর যেহেতু বলতেই হবে, নাদিরা বেগম সচরাচর যা করে, জমিয়ে না রেখে বলে ফেলে।

নাদিরা বেগম খায়নি বলে খেতে বসে কায়সার রাগ দেখাতে শুরু করল—এর কোনো মানে হয়! তোমার নিয়ম করে খাওয়া, ঘুম এসব দরকার...।

কিসে আমার ভালো আর কিসে মন্দ, এইটা আমি বুঝি বাপ।

হ্যাঁ, তুমি তো বোঝোই।

বুঝি।...একটা কথা কও। ওই নাজিয়া মেয়েটারে তুমি

ভালোবাসো?

খাওয়া থামিয়ে কায়সার ঝট করে তাকাল। চোখ নামিয়ে নিয়ে চুপ করে থাকল।

চুপ কইরা আছ ক্যান! বলো।

তুমিই না বললে, তুমি সব বোঝো।

তোমার মুখ থেকে শুনলে ভালো হয়।

হুঁ।...এমনি আর নিয়ে আসিনি।

এইটা কুনো ব্যাপার না।...মেয়েটা তোমারে ভালোবাসে?

হুঁ।... তোমার সঙ্গে দেখা করতে এল তো সে জন্যই।

বাপ, কারোর বাড়িতে কারোর আসা, কারোর সঙ্গে দেখা করতে আসা, এইটা ভালোবাসা না। এসব ছাড়াও ভালোবাসা হয়, আবার এসব বেশি বেশি থাকলেও ভালোবাসা নাও হইতে পারে।

পারে।...আমাদের সম্পর্কের দেড় বছর হয়ে গেছে।... মা...।

নাদিরা বেগম কায়সারের দিকে তাকাল। কায়সারের চোখে-মুখে সামান্য দ্বিধা—তোমার সব কথা ঠিক ঠিক বুঝতে পারছি না। তোমার কি নাজিয়াকে পছন্দ হয়নি?

খুবই পছন্দ হইছে।

কায়সার আরো কিছু শোনার অপেক্ষায় থাকল।

খুবই পছন্দ হইছে বইলাই এত সব কথা।...তুমি খাওয়া থামাইছ ক্যান?

তুমি বলো।

বাপ, আমার কথা মাত্র দুইটা।

বলো।

তার আগে আরো দুইটা কথা।

আহা আম্মা, এত পেঁচিয়ো না।

তোমরা দুজন বিবাহ করবা?

সম্পর্ক হবে, কিন্তু বিয়ে করব না, আম্মা, আমরা এ রকম ভাবি না।

মনস্থির?

জি।

সব দিক ভাইবা দেখছ?

জি।

নাদিয়া বেগম সামান্য হাসল। এই বয়সে সমস্যা হইল, মনে হয় সবই দেখা হইছে। কিন্তু কত কী যে বাকি থাকে! থাক, এইটা ব্যাপার না, এইটাই নিয়ম।

আম্মা, তুমি বলবা?

মেয়ের বাড়ির খবর নিছ?

টুকটাক।...আম্মা, এখন আর আমরা সব কিছু জিজ্ঞেস করি না।

জানি। ঘরে বইসাও বাইরের পৃথিবী যে বদলাইছে, টের পাই। তবু বিবাহের ব্যাপার যখন, কিছু খবর নিতেই হয়।

তা নিলাম। কিন্তু...ধরো, একটা খবর ধরো, দেখলাম ভালো না। সেই জন্য আমাদের দুজনের কি বিয়ে করা উচিত হবে না?

ঠিক তা না।...বিবাহ বন্ধ হওয়ার কারণ দেখি না। কারণ সংসার করবা তোমরা।

ওদের বাসায় যাইনি। যা কিছু শুনেছি নাজিয়ার মুখ থেকে, মনে হয়েছে ওদের ফ্যামিলির ভেতরকার সম্পর্ক খুব ভালো।

আমারও তাই ধারণা। মেয়েটার সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথা বললে বোঝা যায় সে ভালো ফ্যামিলির মেয়ে। সে সরল আবার বুদ্ধিমতী।...তুমি কি তার জিদ টের পাইছ?

জিদ? না, আম্মা। আমার মনে হয় সে একটু ন্যাকা।

না, জিদ আছে। অনেক জিদ আছে।...বাপ, এখন তোমারে কথা দুইটা বলি?

জি, আম্মা।

জীবনে কিছুই নিশ্চিত না। তোমরা দুইজন দুইজনরে বিশ্বাস করো। জীবনে কিছুই নিশ্চিত না, সেই জন্য সব সম্ভব। সেই জন্য বলি, বিশ্বাস যদি সে কখনো ভাঙে, ভাঙবে। তুমি তারে যে বিশ্বাস দিছ, সেইটা ভাঙবা না।

আম্মা, আমি ভাঙব না।
কথা দিতেছ?
জি।
কখনো যেন শুনতে না হয় তোমারে বিশ্বাস কইরা সে ঠকছে।
আম্মা, আমি...।
এইবার দ্বিতীয় কথা। তোমার বাবা সম্পর্কে বলছ তারে?
একটুক্ষণ চুপ করে থাকল কায়সার—বলেছি বাপ মারা গেছেন।
এইটুকু বললে বলা হইল! সব বলবা—উনি কী করতেন, কিভাবে মারা গেলেন, সব বলবা।...বুঝছ?
জি।
যে মেয়েরে তুমি বিবাহ করতে চাও—নাদিরা বেগম বললেন—সেই মেয়ের এই সব জানা থাকা দরকার।
মোহাম্মদ আতিকুজ্জামানের মন সন্ধ্যা পর্যন্ত ভালো ছিল।
সকালে বা সন্ধ্যায় এলাকার যে পার্কে সে হাঁটতে যায়, সেখানে প্রায় সবার সঙ্গেই তার ওঠাবসা, ভালো সম্পর্ক। সবাই মিলে একটা ক্লাবও বানিয়েছে তারা—এসো জীবনের গান গাই। ক্লাবের নাম কী হবে, এ নিয়ে তাদের বিস্তর আলোচনা হয়েছিল। নানাজনের নানা নাম প্রস্তাব। আতিকুজ্জামানও তার পছন্দের নাম জানিয়েছিল। পরে সে যখন দেখল, 'এসো জীবনের গান গাই' নামটা ফাইনাল হয়ে যাচ্ছে, সে মৃদু আপত্তি তুলতে গিয়েছিল। তার গানের গলা ভালো না। গানটান গাইতে হলে সবাই পারলেও সে পারবে না। পরে অবশ্য মাহমুদ তাকে বুঝিয়েছিল, এই গান সেই গান না, মানে গলা ছেড়ে বা গুনগুনিয়েও গাইতে হবে না, এটা হচ্ছে অন্য একটা ব্যাপার। এটুকু জেনে আতিকুজ্জামানের আপত্তি আর থাকেনি—মাহমুদ, ব্যাপার দেখছ, যদি ওই দিন কয়া ফেলতাম, না ভাই, এসব গানফানের মইধ্যে আমি নাই, কী বেকায়দায় পড়তাম।
এই এসো জীবনের গান গাই সংঘের উদ্যোগে আলোচনা সভা, পার্কেই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাকি জন্মদিন, সুতরাং তারা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আলোচনা করবে, নাচ-গানও হবে। এই পর্যন্ত ঠিক ছিল, তার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু যখন ঠিক হলো তাকেও কিছু বলতে হবে, আতিকুজ্জামান বেঁকে বসল—আরে, আমার বলার দরকার কী?
আমরা সবাই একটু একটু করে বলব।
আমাদের সবার একটু একটু করে বলার দরকার কী!
আছে, কারণ এটা আমাদের অনুষ্ঠান।
আতিকুজ্জামান ডেকে পাঠাল মাহমুদকে। মাহমুদের সব ভালো, শুধু সময়জ্ঞান ভালো না। সে যদি বলে সকাল এগারোটায় আসবে, তবে বেশির ভাগ দিন সে আসে সকাল নয়টায় কিংবা দুপুর একটায়। আতিকুজ্জামানকে অবাক করে দিয়ে মাহমুদ সেদিন ঠিক সকাল এগারোটায় উপস্থিত হলো।
মাহমুদ, ঝামেলায় পড়ছি।
ঝামেলা আপনেরে ছাড়ে না। এইবার কী হইছে?
তোমাদের একজন কবি আছে না? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর?
সমস্যা কী?
তার নাকি জন্মদিন। এই জন্মদিন আবার এসো জীবনের গান গাই সংঘ পালন করব। বক্তৃতা দিব। আমারেও দিতে হইব।
দিবেন। মাহমুদের মুখে হাসি।
হাসবা না। আমার মাথায় চুলা জ্বলতেছে।
কতক্ষণের বক্তৃতা?
বুঝতেছ না? স্টেজে দাঁড়ায়া কিছু কইতে পারলেই হলো।
হাততালি?
হাততালি তো দরকার। দরকার না, কও।
কাগজ দেন। লেইখা দেই।
মাহমুদ লিখে দিল মিনিট কয়েকের মধ্যে। পড়ে শোনাল—ঠিক আছে ভাই?
আতিকুজ্জামানকে হতভম্ব দেখাল—ওইটা কী লিখছ?
কোনটা?
আমার মৃত্যুর পর যেন রবীন্দ্রসংগীত বাজে।...এইটা কী লিখছ মাহমুদ, আমি মইরা পইড়া থাকব আর রবীন্দ্রসংগীত বাজব! আরে, তখন আল্লাহ-খোদার নাম নিব।
আপনি মন দিয়ে শুনেন নাই। আল্লাহ-খোদা, আয়াত-কালাম, দোয়া-দরুদ সব আছে। সেই সব বাদ যাইব ক্যান। কিন্তু পাশাপাশি আরেক ঘরে মৃদু স্বরে রবীন্দ্রসংগীত বাজব। রবীন্দ্রসংগীত আপনি এতই ভালোবাসেন, আপনে চান মৃত্যুর পরও পরিবেশ রাবীন্দ্রিক থাকুক।
কী দিক?
রাবীন্দ্রিক।
তোমার বয়স হইছে মাহমুদ। তোমার মগজে জং ধরছে।
এ নিয়ে কতক্ষণ তর্কাতর্কি চলল। শেষে মাহমুদের কথা মেনে নিল আতিকুজ্জামান। যখন মাহমুদ বলল—আমার কোন কথা শুনে ঠকছেন ভাই, এইটা কন—তখন আতিকুজ্জামান আর কিছু বলার খুঁজে পেল না। সে শুধু বিড়বিড় করে বলল, ঠকি নাই, এইটা ঠিক। এহনো তোমারেই ডাকি। কিন্তু এইবার ফাঁসব, বুঝতেছি। কেমনে পড়ব, এইটা অ্যাকটিং কইরা দেখায়া দাও।...মাবুদ, তুমি থাইকো।
আতিকুজ্জামানের বক্তৃতা প্রচুর হাততালি পেল। সে মঞ্চ থেকে নামার পরই দু-তিনজন এগিয়ে এসে তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে গেল। অনুষ্ঠান শেষেও এ নিয়ে অনেক কথাবার্তা হলো। কেউ কেউ বলেও ফেলল, আসলে এ রকম একটা ভাবনা তারও ছিল; যদিও দু-একজন বলল, মৃত্যুর পর সৃষ্টিকর্তার নাম ছাড়া আর কিছুই নেওয়া উচিত না—এই কথা চাপা পড়ে গেল অনেকের এ রকম কথায় সৃষ্টিকর্তা থাকবেনই। তার নাম তো আমরা নেবই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য সৃষ্টির কথাও আমাদের ভাবতে হবে। নিকটজনের মৃত্যুতে তাকে শেষ দেখা দেখতে এসে আমাদের মন যদি শান্ত আর সংহত হয়ে থাকে, অসুবিধা কী?
বাড়ি ফিরে স্ত্রী হাসিনা বা মেয়ে নাজিয়া কাউকেই পেল না আতিকুজ্জামান। তার খুব কথা বলতে ইচ্ছা করছে। হাসিনা এসব তেমন একটা বুঝবে না, তবু বলা যেত তাকে, কিন্তু সে বান্ধবীদের সঙ্গে মালয়েশিয়া বেড়াতে গেছে। তার ফিরতে আরো দুই দিন বাকি। মেয়ে নাজিয়ার সঙ্গে তার খুব একটা কথা হয় না। মেয়ের দোষ নেই, মেয়ে কথা বলতেই চায় তার সঙ্গে, কিন্তু কিছুক্ষণ পর সে কথা খুঁজে পায় না। মেয়ের তখন উঠে যাওয়া ছাড়া আর কী-ই বা করার থাকে।
নাজিয়াকেই সে পেল কিছুক্ষণ পর। সে বের হবে বলে বারান্দায়, নাজিয়ার গাড়ি এসে ঢুকল, নাজিয়া নামল, আতিকুজ্জামান হাসল—ভার্সিটি গেছিলি?
হুম্‌ম্‌। তুমি কোথায় যাও?
আমাদের একটা ক্লাব আছে না, এসো জীবনের গান গাই—ওই ক্লাবের একটা অনুষ্ঠান ছিল বিকেলে।
এখন সন্ধ্যাও শেষ। মানে ওই অনুষ্ঠানও শেষ। বাবা, তুমি কোথায় যাও? আমি আরো ভাবলাম, তোমার সঙ্গে গল্প করব।
আতিকুজ্জামান একবার ভাবল, যাবে না সে, যেখানে তার এখন যাওয়ার কথা, সেখানে তার যাওয়া এখন দরকার বৈকি; কিন্তু যদি না যায় সে, খুব একটা কিছু এসে-যাবে না। সে বরং সময় কাটাবে নাজিয়ার সঙ্গে। এই ইচ্ছাটা তার হলো, মেয়ের দিকে তাকিয়ে ইচ্ছাটা বাড়লও তার, আবার তার ভয়ও হলো, দেখা যাবে গল্প করতে বসে নাজিয়া একটু পর এমন সব কথা বলতে শুরু করেছে, সে তার কিছুই বুঝতে পারছে না। নাজিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসল সে—আজ বৈকালে একটা অনুষ্ঠান করলাম আমরা।
নাজিয়ার ভুরু একটু কুঁচকে গিয়েই স্বাভাবিক হলো—বলেছিলে তুমি। আমি যেতে চেয়েছিলাম। তুমি বারণ করলে।
আরে না, না। এই সব আমি বুঝি নাকি!
কয়জন বোঝে। না বুঝেই লোকজন বলে আর যায়। না বুঝেই হাততালি দেয়। আমি আর কায়সার সেদিন এসব নিয়ে খুব হাসাহাসি করছিলাম।
আতিকুজ্জামান বোকার মতো হাসল, এর পরই তার খেয়াল হলো—কায়সার কে, মা?
আমার বন্ধু। আমার সঙ্গে পড়ে। খু-উ-ব শার্প।
ও!

একদিন নিয়ে আসব।...একদিন এসেওছিল তো। তুমি ছিলে না, মায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে।

আইনো। পরিচিত হব।...যাও মা, সারা দিন পর ফিরছ।

তোমার অনুষ্ঠান কেমন হলো? তুমিও বক্তৃতা দিয়েছ। দাওনি?

আতিকুজ্জামানের সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল।

কী বলেছ, বলো তো?

আতিকুজ্জামানের লজ্জা লজ্জা করল। তবে সে জানাল, সে কী বলেছে। বলা শেষ হওয়ার আগেই সে দেখল নাজিয়ার মুখে হাসি। হাসল আতিকুজ্জামানও।

মাহমুদ চাচা লিখে দিয়েছে, না?

আতিকুজ্জামান লাজুক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল।

মাহমুদ চাচা হচ্ছে ইবলিস।

আতিকুজ্জামান এবার হো হো করে হাসতে শুরু করল—ক্যান, সে ইবলিস ক্যান!

তুমি জানো না, বলো জানো না সে ইবলিস?

আতিকুজ্জামানের হাসি বড় হলো—জানি। তুমি ঠিক বলছ। সে ইবলিস।

এই ইবলিসকে তুমি আর পাত্তা দেবে না, বুঝেছ?

আতিকুজ্জামান মাথা ঝাঁকাল, না, এই ইবলিসকে সে আর পাত্তা দেবে না। মাথা ঝাঁকিয়ে সে গাড়িতে উঠে পড়ল। তার মুখে মৃদু একটা হাসি অনেকক্ষণ থাকল। এর ভেতরই 'কায়সার' নামটা বারকয়েক উঁকি মারল। আচ্ছা, এই কায়সারটা কে? এর কথা সে কি নাজিয়ার মুখে আগেও শুনেছে? সে মনে করতে পারল না শুনেছে কি না। সে যা-ই হোক, নামটা টুকে রাখতে হবে, তার মনে হলো। নাজিয়া যখন কায়সারের কথা বলছিল, তার মুখ কিছুটা হলেও বদলিয়েছিল। বদলাক, তেমন সম্পর্ক থাকলে বদলাতেই পারে। আর তেমন কোনো সম্পর্ক যদি থেকেও থাকে, তার আপত্তি নেই। কিন্তু কোথাও ভুল হচ্ছে কি না, এটাও দেখতে হবে। এ বয়সের ছেলেমেয়েরা অনেক ভুল করে।

পোশাক পাল্টে হাত-মুখ ধুয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ দোলনায় দুলল নাজিয়া। তার ঘরটা দেখার মতো। আকারে বিশাল, চারজন মানুষের জন্য চারটা ঘর হতো এ রকম। ঘরের ভেতর নেই-ও বা কী। দোলনা একটা ছিল বারান্দায়। হঠাৎ বাবা একদিন বললেন—তোমার ঘরের ভেতরও একটা দোলনার ব্যবস্থা করে দেই। নাজিয়া দরকার নেই, দরকার নেই বলার সময়ও পেল না, তার আগেই ব্যবস্থা হয়ে গেল। বাবা মাঝেমধ্যেই এটা-ওটা কিনে আনে। জিনিসটা নাজিয়ার আদৌ দরকার কি না, তাও ভেবে দেখে না।

নাজিয়ার মাঝে মাঝে রাগ হয়—এটা কী?

এইটা কী, সেইটা কি আমি জানি!

না জেনেই কিনলে?

কিনলাম।

আশ্চর্য! এটা কী, তা তুমি জানো না, এটা আমার দরকার কি না, তাও তুমি জানো না...।

দেখলাম, তোর বয়সী খুব সুন্দর চেহারার মেয়ে, তোর মতো অত সুন্দর না, কিনল। আমি ভাবলাম তাইলে তোরও একটা দরকার।

তুমি এভাবে আর কিনবে না, প্লিজ বাবা।

বাবাকে বলে লাভ নেই, নাজিয়ার জানা হয়ে গেছে। তবে তার এত বড় ঘর নানা ধরনের অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে যে ভরে যাচ্ছে, এই দেখে সে মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়। আর বিরক্ত হয় তার পড়ার টেবিলের ওপর মাঝে মাঝেই বাবার টাকা রেখে যাওয়া দেখে। টাকা তার দরকার নেই। মাস পহেলা তার হাতে অনেক টাকা চলে আসে। তার নামে একটা ব্যবসা আছে, তার কখনো যেতে হয়নি, বাবা যায় মাঝে মাঝে, মালিকানা তার নামে, সেখান থেকে টাকা আসে। সেই টাকাই তার পক্ষে খরচ করা সম্ভব না, ব্যাংকে জমা রাখতে হয়, এর ওপর আবার যদি টেবিলের ওপর টাকার বান্ডিল, মেজাজ খানিকটা গরম হতেই পারে—বাবা, এত টাকা দিয়ে আমি কী করব!

সেইটা আমি ক্যামনে বলব, তুমি কী করবা!

আমাকে না বলে আমার টেবিলে আর টাকা রাখবে না।

আচ্ছা।

বাবা 'আচ্ছা' বলে, দুদিন পর আবার টাকা রাখে। বাবার ভালোবাসাটা নাজিয়া খুব টের পায়। একটু বেশি রকমের ভালোবাসা। মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে যেতে হয়। তবে এটাও ঠিক যে বাবার এই ছেলেমানুষি ভালোবাসা কতটা প্রিয় তার। এ রকম একটা বাবা থাকলে, আর কি কিছু লাগে–এমনটা তার প্রায়ই মনে হয়। তখন দুই চোখের কোণ তার ভিজে যায়। সে টের পায়, সে নিজেও বাবাকে কী ভীষণ ভালোই-না বাসে। মানুষটা লেখাপড়া শেখেনি তেমন, নিজেই বলে–কলেজ পর্যন্ত পইড়া দিলাম ছাইড়া–কিন্তু মেয়ের লেখাপড়া নিয়ে তার কতই-না চিন্তা। লোকটা গুছিয়ে কথা বলতে পারে না, অশুদ্ধ বাংলা, ভুল উচ্চারণ–কিন্তু এই নিয়ে নাজিয়া কখনো বিব্রত হয় না–তার বাবা এ রকম, এই হলো ব্যাপার। বাবা সম্পর্কে টুকটাক কিছু কথা কানে এসেছে তার, এখনো হঠাৎ হঠাৎ আসে। বাবার অতীতটা নাকি তেমন সুবিধার নয়। একসময় একনামে তাকে নাকি অনেকেই চিনত। কেউ কেউ বলে, বাবা নাকি খুব ছোট অবস্থা থেকে উঠে এসেছে। এ ধরনের আরো কিছু কথা। সেসব কথা নাজিয়ার ঠিক বিশ্বাস হতে চায় না। সে তো মানুষটাকে দেখছে। এই মানুষটা খারাপ হয় কী করে! আর কোনো সময় খারাপ যদি কিছু থেকেও থাকে, সেটা নিয়ে কেন সে ভাবতে যাবে! সে দেখবে এখনকার মানুষটাকে। সে তো দেখছেই এই লোকটার ব্যবহার, সে তো দেখছেই এই লোকটার দরোজায় সাহায্যের জন্য এসে কেউ খালি হাতে ফিরে যায় না। এই এখনকার লোকটাই আসল। অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেলে অনেকেরই অনেক কিছু বেরিয়ে পড়বে। যদি এমনও হয়, লোকটা খুব নীচু অবস্থা থেকে উঠে এসেছে, তাতেও কিছু এসে যায় না। কজন পারে ছোট অবস্থা থেকে নিজেকে তুলে আনতে! এ ধরনের একজন মানুষকে নিয়ে সে বরং গর্বই করবে। অবশ্য এও ঠিক, এ রকমও তার মাঝে মাঝে মনে হয়, বাবাকে জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়–এই যে সে টুকটাক যেসব শুনেছে, এখনো হঠাৎ কিছু একটা শুনে ফেলে–এসব নিয়ে বাবাকে জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়? এ রকম হঠাৎ তার মনে হয় বটে, তখন এমনও তার মনে হয়–কী দরকার!

দোলনা থেকে নেমে এসে শুয়ে থাকল কতক্ষণ। উঠে বসল। সে টের পেল তার রাগ হচ্ছে। খুব রাগ হচ্ছে তার। এখন কায়সার সামনে থাকলে বড় ধরনের খামচি খেতে হতো তাকে। আচ্ছা, ঠিক আছে, পাওনা থাকল, আগামীকালই খামচি খাওয়া হাত নিয়ে কায়সারকে ভার্সিটিতে ঘুরে বেড়াতে হবে। তখন বুঝবে।

নাজিয়া কম্পিউটারের সামনে এসে বসল। বিছানার ওপর একটি ল্যাপটপ চকচকে চেহারা নিয়ে পড়ে আছে; কিন্তু নিতান্তই বাধ্য না হলে সে ল্যাপটপে হাত দেয় না। তার অসহ্য লাগে। সে কম্পিউটার ওপেন করে ফেসবুকে গেল। তার একটা ফেক প্রোফাইল আছে। ছেলের। ব্রাড পিটের মতো একজনের একটা ছবি দিয়েছে। ফটোশপে কিছু কাজ করতে হয়েছে অবশ্য। ফটোশপে সে খুব একটা ভালো পারে না। ওই কাজটা কায়সার করে দিয়েছে। খালিদ মাহমুদ নামের ওই প্রোফাইলে তার অধিকাংশ বন্ধুই মেয়ে। খালিদ নিজেকে খুব ধনী ও স্মার্ট লোক হিসেবে জাহির করে। আজ মুম্বাই যাচ্ছে তো কাল টোকিও, পরশু ইস্তাম্বুল। মাঝে মাঝেই সে বড় ধরনের দার্শনিক কথা (কায়সারের সরবরাহ করা) বলে। মেয়েরা পছন্দ করে। সে একটা স্ট্যাটাস দিলে কমপক্ষে ৫০টা লাইক পড়ে, ৩০টা কমেন্টস। এর মধ্যে জনাবিশেক মেয়ে তাদের ভালো লাগা বা ভালোবাসার কথা জানিয়েছে ইনবক্সে, আর ১০-১২ জন জানিয়েছে, দেশের বাইরে যাওয়ার সময় খালিদ মাহমুদ যদি তাকে সঙ্গী করতে চায়, তার কোনোই আপত্তি নেই, সে বরং খুশি হবে এবং তার ধারণা খালিদ মাহমুদেরও অনেক ভালো লাগবে।

যখন প্রায় কিছুই করার থাকে না, নাজিয়া এই অ্যাকাউন্টটা খোলে। এই খেলাটা বেশ লাগে তার। আজ অবশ্য ভালো লাগল না। দুতিনটা মেইল রিপ্লাই করেই সে সাইন আউট করে নিজের অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে গেল। তখনই কায়সারের ফোনটা এল। নাজিয়া ঠিক করে রেখেছিল, কায়সারের ফোন সে ধরবেই না। ফোনের আওয়াজ সাইলেন্ট করে ফোনটা রিসিভ করল সে, বলল–ছুঁচো।

কী!

একটু আগেই ফেসবুকে তোমার ওয়ালে একটা পোস্টিং দিলাম–Mole.

আমি ছুঁচো? তুমি বলছ?

আমি বলছি। এটা আমার চেয়ে ভালো আর কে জানবে!

কী করছিলে?

খালিদ মাহমুদের অ্যাকাউন্ট খুলে দেখছিলাম কোন কোন মেয়েকে তোমার সঙ্গে ভেড়ামারা বা ছাগলনাইয়া ভ্রমণে পাঠানো যায়।

পেয়েছ?

এখনো পাইনি। তবে চিন্তা কোরো না, পাব।

আমি কবে যাব?

কোথায়?

তোমাদের বাসায়।

আমাদের বাসায় আসতে চাও তুমি?

বা রে...!

এত শখ কেন তোমার!

বা রে! তোমাদের বাসায় যাব না আমি?

কেন!

আহা, নাজিয়া...।

কথা কম বলো। আমার মেজাজ গরম হয়ে আছে।

আম্মাকে কেমন দেখলে?

ভালো।

কতটা ভালো?

খুবই ভালো।

জানতাম।

তবে খুব অবাকও হয়েছি। কেন–শুনবে?

বলো।

এত ভালো একজন মহিলার ছেলে এত খারাপ হয় কী করে!

জানতাম পচাবে। নাজিয়া...।

নাজিয়া 'জানতাম পচাবে'র উত্তরে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কায়সারের 'নাজিয়া' বলার মধ্যে কিছু একটা ছিল, সে থামল।

তোমাকে আমার ফোন অনেক আগেই করা উচিত ছিল। আজ প্রথম তুমি আমাদের বাসায় এসেছ, কেমন লাগল তোমার, আম্মাকে কেমন লাগল, তোমাকে কেমন লাগছিল আমাদের বাসায়–এসব তো বলতে ইচ্ছা করেই।

তাহলে ফোন দাওনি কেন ছুঁচো?

মা খুব রাগ করেছে আমার ওপর।

কিছু হয়েছে কায়সার?

সার্কাস শহীদ যখন ফোন করে জানাল, ঘটনা ভালো না, তখন মন খারাপ হলো আতিকুজ্জামানের। ঘটনা ভালো না শুনলে মন খারাপ হবে, কিন্তু ফোনে এসব কথা পুরোটা শোনা বা বলা যায় না। সুতরাং আতিকুজ্জামান বুঝল না, ঘটনা কতটা খারাপ। তা ছাড়া দড়ি বাবুলের সঙ্গে সার্কাস শহীদের একটা ঠাণ্ডা লড়াই আছে, জানে সে। এই যে দুজন, আছে একসঙ্গে, কিন্তু আবার নেইও, ভেতরে ভেতরে দুজন মুখিয়ে থাকে, এটা আতিকুজ্জামান উপভোগ করে। আবার, সে তো দেখছেও এত দিন, দেখতে দেখতে সে জানে দল চালাতে হলে দলের ভেতর একটা লড়াই ছেড়ে রাখতে হয়, যেন কে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এটা জাহির করার জন্য অন্তত জনাকয়েক ব্যস্ত থাকে। আপাতত মূল লড়াইটা দড়ি শহীদ আর সার্কাস শহীদের ভেতর। এ কারণে সার্কাস শহীদ যখন বলল, ঘটনা ভালো না, খুব একটা গুরুত্ব সে দিল না বটে, তবে একটা খচখচানি থেকে গেল।

বাসা থেকে নাজিয়ার সঙ্গে কথা বলে বেরিয়ে পৌঁছাতে পৌঁছাতে তার ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। ঘণ্টাখানেকের পথ নয়, কিন্তু ঢাকা শহরে পাঁচ মিনিটের পথ পার হতেও এক ঘণ্টা লাগতে পারে। এই এক ঘণ্টা গাড়িতে বসে আতিকুজ্জামানের বিরক্তি বাড়ল।

তার এই বিরক্তি চরমে পৌঁছাল, যখন সে পৌঁছে ঘটনা শুনল। ঘরে দড়ি বাবুল আছে, সার্কাস শহীদ আছে, আছে আরো দু-তিনজন। সবার মুখ গম্ভীর, থমথমে। এ রকম মুখ দেখলে আতিকুজ্জামানের অসহ্য লাগে। সে বসল, আবার এক এক করে সবার দিকে তাকাল। তাকিয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগল, এখন এদেরই কেউ তাকে বিস্তারিত জানাবে। সে রকম কিছু ঘটল না। আর যারা আছে, তাদের আসলে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া মুখ খোলার কথা না। দড়ি আর সার্কাস যেখানে আছে, সেখানে তারা মুখ খোলার প্রয়োজন বোধ করছে না। আবার ওদিকে দড়ি আর

সার্কাসও যেন ঠিক করেছে, কথা বলবে না তারা। কিংবা দুজনের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা চলছে, সে না কথা শুরু করলে আরেকজন করবে, তারপর তার যা বলার সে বলবে।

দুজনের রগ চেনা আছে আতিকুজ্জামানের। দড়ি তার সঙ্গে বহুদিন, সে যদি একবার মুখে তালা দেয় তো দিল, তখন কথা বললেও সে বলবে অর্ধেক অর্ধেক করে। সে কথা শুনে কিছু বোঝা যাবে না, মাঝখান থেকে মেজাজ আরো খারাপ হবে। সুতরাং এখন দড়িকে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। বোঝাই যাচ্ছে অঘটন কিছু ঘটেছে, আর সেটা দড়িই ঘটিয়েছে।

আতিকুজ্জামান চেহারায় কিছুই হয়নি জাতীয় একটা ভাব আনার চেষ্টা করল, সে ফিরল সার্কাসের দিকে—কী খবর শহীদ, কী ঘটনা?

শহীদ বলল—ভাই, আপনে বাবুলরে জিগান।

আমি তোমারে জিজ্ঞেস করতেছি। তুমি বলো।

ঘটনা ভজঘট।

কতটা?

পুরাই।

ভেঙে বলো।

আমি তো ঘটনা ঘটাইনি। ঘটাইছে বাবুল। তারে জিগান।

আমি কারে জিগাব, এইটা তুমি ঠিক করবা? আতিকুজ্জামানের গলা সামান্য গম্ভীর শোনাল।

জি না। সার্কাস বলল। সে আতিকুজ্জামানের গম্ভীর গলা শুনেছে।

তুমি তো ছিলা সঙ্গে।

জি।

ঘটনা দেখছ?

জি।

ঘটনা যে ঘটায় সে দেখে কম, ঘটনা যে দেখে সে দেখে বেশি। তুমি বলো।

আইনুদ্দীনরে এক হপ্তা সময় বরাদ্দ দিছে বাবুল।

মানে! ট্যাকা?

ওই তো, ট্যাকা ফেরত দেওয়ার জন্য আইনুদ্দীনরে আরো এক সপ্তাহ দিছে বাবুলে।

আতিকুজ্জামানের মেজাজ গরম হয়ে গেল। তার কয়েকটা ব্যবসা, তার মধ্যে বড় হচ্ছে টাকা খাটানোর ব্যবসা। কিছু লোক আছে তার, তারা টাকা নিয়ে যায় তার কাছ থেকে। সেই টাকা তারা সুদে খাটায়। মানুষের নানা প্রয়োজন, মাঝে মাঝে টাকাঅলা মানুষও অল্প কিছু টাকার জন্য আটকে যায়। তারা প্রতিমাসে এক লাখে চার হাজার, এই হিসাবে টাকা ধার নেয়। মোটামুটি শান্তির ব্যবসা। শুধু কয়েকটা দিক খেয়াল রাখতে হয়। যে টাকা নেবে তার টাকা পরিশোধ করার ক্ষমতা আছে? দরকার দুই লাখ কিন্তু নিচ্ছে তিন বা চার লাখ, ঘটনা কি এমন? আর থাকে পরিশোধের ব্যাপার। এসব ধার বেশি দিনের জন্য দেওয়ার নিয়ম নেই।

আইনুদ্দীন আতিকুজ্জামানের পুরনো লোক। তার কাছে আতিকুজ্জামানের টাকার পরিমাণ বেশি। এই আইনুদ্দীন গত এক বছর হলো অনিয়মিত। সময়মতো এসে মূল টাকা দূরের কথা, লাভের অংশও ঠিকমতো দিয়ে যাচ্ছে না। ব্যবসার নিয়ম হলো, তোমার ২০ লাখ লাগলে ২০ লাখ নাও, খাটাও, না লাগলে ওই টাকা নিজের কাছে রেখো না। টাকার একটা বড় সমস্যা হলো, কেউ অন্যের টাকা বেশি দিন নিজের কাছে রাখলে সেটা একসময় নিজের ভাবতে আরম্ভ করে।

আইনুদ্দীন এক বছর হলো অনিয়মিত। এইটা বলে-ওইটা বলে, নানা টালবাহানা, নানা গল্প। গল্প শুনতে শুনতে আতিকুজ্জামান বিরক্ত। গল্প কি সে কম জানে! সমস্যা হলো, মাস তিনেক হলো আইনুদ্দীন গল্প বলাও ছেড়ে দিয়েছে। বারবার তার এক কথা—ঝামেলায় আছি। আটকায়া গেছি। তা আইনুদ্দীন ঝামেলায় থাক, আটকিয়ে যাক, আতিকুজ্জামানের মাথাব্যথা নেই, তার টাকা আটকে আছে, মাথাব্যথা এইখানে। আবার, এ রকম একটা খবরও পেয়েছে সে, আইনুদ্দীন নিজেই ব্যবসা শুরু করবে। করুক, নিজের টাকায় করুক, আতিকুজ্জামানের আপত্তি নেই, তার টাকায় করলে তার আপত্তি। লোকসান গুনতে হবে, বেয়াদবি সহ্য করতে হবে, একজন তাকে কলা দেখাল, এটা মেনে নিতে হবে, সবচেয়ে বড় কথা—আইনুদ্দীনের দেখানো পথ ধরে আরো কেউ কেউ হাঁটতে চাইবে।

দড়ি বাবুল আর সার্কাস শহীদকে পাঠানো হয়েছিল ভাবনাচিন্তা করেই। আইনুদ্দীন যখন একই কথা বলতে লাগল, একপর্যায়ে যখন তার ফোন ধরাই প্রায় বন্ধ করে দিল, তখন আতিকুজ্জামানকে এই সিদ্ধান্তটা নিতে হলো। যদি টাকাগুলো মার যায় যাক, টাকা কিছু মার যাবে, এটা ব্যবসার ভেতরই পড়ে যেমন, টাকা যে মেরে দেবে, তার বেঁচে থাকার প্রয়োজন থাকবে না, এটাও ব্যবসার মধ্যেই পড়ে।

দড়ি বাবুল আর সার্কাস শহীদকে পাঠানো হলো চার-পাঁচজন লোকসহ। দুজনকে একসঙ্গে পাঠানোর কারণ আছে। পরিস্থিতি তার তেমন করে জানা নেই। যদি সত্যিই এমন হয়, আইনুদ্দীন তার এলাকায় দল তৈরি করে ফেলেছে, তবে দড়ি বা সার্কাসের একার পক্ষে সামাল দেওয়া কঠিন হবে। আর দুজনের মধ্যে যখন ঠাণ্ডা লড়াই আছে, দুজনেই কাজটার কৃতিত্ব নিতে চাইবে। এতে ভণ্ডুল হওয়ার একটা আশঙ্কা অবশ্য থেকে যায়। তবে কিছু রিস্ক নিতেই হয়। তা ছাড়া নিজেকে জাহির করতে গিয়ে ভণ্ডুল করে দেওয়ার মতো বোকা দুজনের কেউই না।

ঘটনা শেষ পর্যন্ত ভণ্ডুলই হয়েছে, সার্কাসের কথা শুনে মনে হচ্ছে দোষ দড়ির। এখন দড়ির কথা শোনা দরকার।

দড়ি, কথা সত্য? আতিকুজ্জামান জিজ্ঞেস করল।

দড়ি বাবুল হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

দুইটা জিনিস আমারে একটু বুঝায়া বলবা?

জি।

কাউরে বাড়তি সময় দেওনের মালিক কি তুমি?

জি না। আপনে।

আমারে ফোনে জিগাইছিলা?

জি না। আমি ভাবলাম আপনে বুঝবেন।

তুমি ভাবলা আর ডিসিশন নিয়া নিলা!

দড়ি চুপ করে থাকল।

এইবার বলো, ক্যান তারে তুমি সময় বাড়ায়া দিয়া আসলা। কারণ কী?

সে বলল আর ১০ দিন। ১০ দিনের মইধ্যে সে ট্যাকা শোধ কইরা দিব।

সে এইটা বলল আর তুমি বিশ্বাস গেলা!

ভাই, আমি মানুষ চিনি।

আইনুদ্দীনরে চিন্না ফেলছ।

আচ্ছা, ধরেন—মানুষ চিনি না। কিন্তু কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা, এইটা আমি বুঝি।

এইটা বুঝো? সত্য-মিথ্যা বুঝো?

জি।

এক কাম করো দড়ি। এই কাম ছাইড়া দাও, পীর হইয়া যাও। ভালো করবা।

দড়ি চুপ করে থাকল আর সার্কাস খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে আরম্ভ করল।

হাসবা না। আতিকুজ্জামান গম্ভীর গলায় বলল। তুমি কী করলা? বাবুলে অফ গেল আর তুমি কী করলা? সার্কাস দেখলা?

কমান্ডে বাবুলে ছিল। সে সিনিয়র।

তুমিও তো আমারে ফোনে তখন-তখন জানাইতে পারতা!...বাবুল, যদি আইনুদ্দীন ট্যাকা না দ্যায়?

দিব।

যদি না দ্যায়? যদি মাটির তলে চইলা যায়?

ভাই, দায়িত্ব আমার।

সে না দিলে তুমি দিবা?

জি ভাই, দায়িত্ব আমার।

মনে রাইখ। আতিকুজ্জামান কঠিন গলায় বলল। সে প্রচণ্ড হতাশ বোধ করছে। টাকা ফেরত পাওয়া যায়নি, আইনুদ্দীনের কোনো ব্যবস্থা হয়নি, এসব তাকে বিরক্ত করেছে। সে হতাশ বোধ করছে দড়ি বাবুলের কারণে! তার হয়ে অন্তত ২০টা খুন করেছে যে মানুষ, সে কিছুদিন হলো এমন অদ্ভুত আচরণ শুরু করেছে কেন! অন্য কোথাও ভাঁজ খেয়েছে?

আতিকুজ্জামান বাসায় ফিরল গরম মেজাজ নিয়ে। সে টের পেল, শুধু যে তার মেজাজ গরম হয়ে আছে তা নয়, যথেষ্ট অস্বস্তিও তার ভেতর কাজ করছে, এই দুইয়ের সঙ্গে বিরক্তিও থেকে গেছে। তার বয়স হয়েছে, বয়স হলে অনেক ছোট ঝামেলাও বড়

মনে হয়। এ রকম কিছু যদি বছরদশেক আগে ঘটত, কিছুই মনে হতো না তার, আর মনে হলেও সহজ একটা সমাধান ঠিকই বেরিয়ে যেত। এখন সমস্যাটাই ঠিকমতো বুঝতে পারছে না সে, সমাধান পরের কথা।

একসময় সে ফোন করল দড়িকে—তুমি কি মনে করো কামটা তুমি ঠিক করছ?

জি ভাই। আমি ভুল করি নাই।

তোমার বয়স কত হইল?

সেইটা আপনি জানেন।...ভাই, আমার এখনো ইস্তফা দেওনের বয়স হয় নাই।

বুঝলাম। কিন্তু লক্ষণ ভালো দেখতেছি না। একটা কাজ করবা?

বলেন।

বেড়াইতে যাও।

আমি বেড়াইতে যাব?

তুমি বেড়াইতে ভালোবাসো না? সমুদ্রে যাও...তুমি তো একবার বলছিলা শেষ বয়সে জঙ্গলে গিয়া থাকবা।

ভাই, কত বছর ধইরা আপনার পাশে আছি, এইটা আপনে জানেন। চোগলখোরি করি নাই, এইটাও আপনি জানেন। এখন যদি ছাড়ায়া দিতে চান, বলবেন। সইরা যাব।

তুমি বেশি বুঝো। তোমারে দেইখা অস্থির-অস্থির লাগল। তাই ছুটির কথা বলতেছি।

একটা কথা বলব? মনে কিছু নিবেন না তো?

বলো।

আমি ছুটিতে গেলে আইনুদ্দীনের কাজটা কি সার্কাসরে দিয়া সারবেন?

ধ্যাৎ। বললাম না—তুমি বেশি বুঝো।

ভাই, আমি আপনেরে বলছি, আইনুদ্দীনের দায়িত্ব আমার। সে ট্যাকা দিতে আবার ত্যাড়ামি করলে আমি নিজ হাত তারে জবো করব।

তাইলে ট্যাকা ফেরত পাইবা?

আইজ তারে গুলি কইরা ফেলায়া আসলে কি ট্যাকা ফেরত পাইতেন?

আতিকুজ্জামান খেপে গেল—এত যুক্তি দেখাও ক্যান, অ্যাঁ, এত যুক্তি দেখাও ক্যান! যুক্তি দিয়া সব হয় না, এইটা তুমিও জানো, আমিও জানি।

ছাদে গিয়ে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করল আতিকুজ্জামান। তার মন ভালো হলো না। একবার মনে হলো, নিচে নেমে নাজিয়ার সঙ্গে কথা বলবে। সে আগেও দেখেছে, তার মন খারাপ থাকলে, সে ঝামেলায় থাকলে, কে জানে কী জাদু আছে নাজিয়ার ভেতর, মন ভালো করে দিতে পারে। অথচ এখন, যদিও তার বারবার নাজিয়ার কথাই মনে হচ্ছে, আবার সাড়াও পাচ্ছে না, তার মনে হচ্ছে, নাজিয়ার সঙ্গে কথা বলে কোনো লাভ হবে না। কেন লাভ হবে না, কেন এখন নাজিয়া তার মন ভালো করতে পারবে না, এটা সে কিছুক্ষণ বোঝার চেষ্টা করল। কিছুক্ষণ পর তার মনে হলো—এই চেষ্টায় লাভ হবে না।

সে ফোন করল সার্কাস শহীদকে—ঘটনা কী, বলবা?

ভাই, আমি এইটা কী বলব, আপনে সবই দেখলেন। ঘটনা কী—এইটা আপনে বুঝবেন।

তোমার কী মনে হয়, এইটা বলো।

দড়িরে আমার আউলা আউলা মনে হয়।

হুঁ...।

আউলা হইলে তার সব গেল। সে হয় গিয়া গুড ফর নাথিং।

এত ইংরেজি বলবা না।...আইনুদ্দীনের কথা সত্য না মিথ্যা, এইটা বলো।

কথা সত্য না মিথ্যা, ভাই, এইটা তো বড় কথা না।

তো?

সে নিয়ম মানে নাই, কথা হইল এইটা।

সার্কাসের কথা খুব পছন্দ হলো আতিকুজ্জামানের। হ্যাঁ, সার্কাস যেটা বলেছে, সেটাই হলো নিয়মমতো কথা। এর বুদ্ধি কম না, সমস্যা একটাই, লোভ বেশি। দড়িকে সরিয়ে এক নাম্বার হওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। লোভী মানুষ নানা সময় নানা বিপদের কারণ হয়, এটা আতিকুজ্জামানের জানা আছে।

ভাই। ওপাশ থেকে সার্কাস বলল। একটা অনুরোধ ছিল।

বলো। সংক্ষেপে বলবা। টাইনা লম্বা করবা না।

আইনুদ্দীনের কাজটা কি হাতে নিব?

আতিকুজ্জামানের ইচ্ছা হলো, সে বলে—হারামজাদা, তুমি যে এইটাই বলবা, সেইটা আমি জানি। এ কথা সে অবশ্য বলল না, সে বলল—আমি তোমারে জানাব।

পরের ফোনটা সে করল মালয়েশিয়ায়, স্ত্রীকে।

স্ত্রী ন্যাকা ন্যাকা গলায় বলল—তুমি আছ কেমন?

সে বলল—আমি আছি কেমন এইটা তোমার জানার দরকার দেখতেছি না। তুমি কায়সাররে চিনো?

স্ত্রী আহত গলায় বলল—তুমি এমন একটা কথা বললা আমারে!

কথা কম বলো। যা জিগাইলাম, উত্তর দাও। কায়সাররে চিনো?

কে? কোন কায়সারের কথা বলছ?

নাজিয়ার বন্ধু। একসঙ্গে পড়ে।

নাহ। একটু বিরতি নিয়ে আতিকুজ্জামানের স্ত্রী বলল। মনে পড়ছে না।

নাজিয়া কুনোদিন বলে নাই?

নাহ।...কী হয়েছে?

কিছুই হয় নাই। তুমি ঘুরো। তুমি ঘুরো আর ট্যাকা উড়াও। মেয়ের বন্ধু কে, এই খবর রাখার তোমার কী দরকার!

মাহমুদ বুঝতে পারছে না সে কী করবে। প্রথমে তার কিছুটা সন্দেহ ছিল সে ঠিক দেখেছে কি না! এই সন্দেহটুকু তার থাকেনি। নাজিয়াকে সে চিনতে পারবে না, এটা হয় না। আবার নাজিয়ার এই এলাকায় আসার কোনোই কারণ নেই, এটাও হতে পারে না। সে দূর থেকে দেখেছে বটে, কিন্তু নাজিয়া আর একটা ছেলে যে একসঙ্গে গাড়িতে উঠেছে, নাজিয়ার গাড়িতে, এখানে ভুল হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু নাজিয়া এ এলাকায় কেন!

এই যে একটু আগে সে ভাবল, নাজিয়ার এ এলাকায় আসার কারণ থাকতেই পারে, কথাটা মিথ্যা না। কারণ থাকতেই পারে, একটা দুটো বা অনেক। এ এলাকায় তার বন্ধু থাকতে পারে, এ এলাকায় তার কোনো কাজ পড়ে যেতে পারে, এমনকি এলাকায় সে বেড়াতেও আসতে পারে, এ রকম আরো নানা রকম। এ রকম ভাবছে বটে মাহমুদ, কিন্তু মন থেকে সে অস্বস্তিটুকু দূর করতে পারছে না। এই যে একটা ছেলের সঙ্গে সে নাজিয়াকে দেখেছে, এটা মাহমুদকে ভাবাচ্ছে না। একটা ছেলের সঙ্গে তাকে দেখা যেতেই পারে। ভার্সিটিতে পড়ে মেয়ে, তার বন্ধু থাকতেই পারে। এমনকি ছেলেটা যদি নাজিয়ার ঘনিষ্ঠ বন্ধুও হয়, তাতেই বা তার কী!

কিন্তু এখানে ব্যাপার আছে একটা। ব্যাপার কী হতে পারে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র ধারণা সে তৈরি করতে পারছে। ফলে তার অস্থিরতা বাড়ছে। সে কি ফোন করবে জায়গামতো? কিন্তু কী বলবে? নাজিয়াকে এ এলাকায় দেখা গেছে, এটা কি বলার মতো কিছু? যদি সে বলে আর যদি এমন উত্তর আসে—'হ, গেছে, তো অসুবিধা কী হইছে', তখন তাকে—'জি আতিক ভাই...না, আতিক ভাই', এসব বলে সামাল দিতে হবে। সামাল দিতে পারবে তো? আতিকুজ্জামানকে সব সময় সামাল দেওয়া যায় না।

সুতরাং ফোন করার পরিকল্পনা সে বাদ দিল। তবে অস্বস্তিটুকু বাদ দিতে পারল না। তাকে অন্যমনস্ক দেখে পাশের চেয়ার থেকে আবদুল লতিফ জিজ্ঞেস করল—মাহমুদ ভাই, কী ভাবেন?

সমস্যায় আছি রে ভাই।

হেলপ লাগলে কইয়েন।

হিসাব মিলতেছে না।

আপনেরে কইলাম ওই রিপোর্টটা ছাপেন। ওইটা ছাপলে কিছু মালপানির ব্যবস্থা হইত।

তো?

আপনার মালপানির হিসাব মিলত।

মিয়া, এইটা যে মালপানির হিসাব, এইটা তোমারে কে কইছে?

তো কী?

মালপানির হিসাব ছাড়া আর কোনো হিসাব থাকতে পারে না?

আবদুল লতিফ দুপাশে মাথা নাড়ল—আর কী হিসাব?

মাহমুদ কতক্ষণ লতিফের দিকে তাকিয়ে থাকল, হঠাৎ তারও মনে হলো—সত্যিই তো, এই রকম ভাবলেই তো চলে—আর কী হিসাব!

শরীর ভালো লাগছিল না দড়ির। হঠাৎ কেমন জ্বর জ্বর ভাব, হঠাৎ মনে হচ্ছে শরীরে কোনোই শক্তি নেই। শরীর নিয়ে সমস্যা নেই দড়ির। কবে সে শেষ অসুস্থ হয়েছে, তাও সে মনে করতে পারে না। অসুখ হলেও সেটা দুদিনের বেশি থাকেনি। আর অসুখ বলতে—জ্বর। আর কোনো অসুখের কথা মনে পড়ে না। আজ ব্যাপারটা অন্য রকম। সে শরীরে জোর পাচ্ছে না। তার হাঁটার অভ্যাস। হাঁটতে ভালো লাগে তার। এখন হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। সে থামল। বাড়ির প্রায় কাছে চলে এসেছে। বাকি এইটুকু পথ সে হেঁটে যেতে পারবে না, নাকি রিকশা নিতে হবে? এখন হুট করে রিকশা পাওয়াও মুশকিল। দড়ি তাকাল রাস্তার দুদিকে। সে কিছু পথচারী দেখল শুধু, কিন্তু খালি কোনো রিকশা নেই। দড়ি টের পেল, সে আরো ক্লান্ত বোধ করছে। সে রাস্তা থেকে একটু সরে দাঁড়াল।

তখন সে শব্দটা শুনতে পেল। চাপা আর্তনাদের শব্দ, চাপা ধমকের শব্দ, গোঙানির শব্দ। দড়ি তাকাল তার পেছন দিকে। পেছন দিকটা অন্ধকার। পেছন দিকটা ঢালু। তাকিয়ে কিছু বোঝা যায় না। তবে শব্দ ওদিক থেকেই আসছে। দড়ি তাকিয়ে থাকল সেদিকে। তারপর সে ঢালু পথ বেয়ে নামতে লাগল। নামতে নামতে সে নিজেই অবাক হলো। কোথায় কিসের শব্দ হচ্ছে, তাতে তার কী এসে যায়! সে কেন সেই শব্দের কারণ জানার জন্য উতলা হয়ে উঠেছে! নিজের ওপর বিরক্ত হলো দড়ি। কিন্তু সে থামল না।

অন্ধকারের মধ্যে পুরো দেখা গেল না, বোঝা গেল। মেয়েটাকে মাটিতে ফেলে দুজন চেপে ধরে রেখেছে, বাকিজন শুয়রের ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে ব্যস্ত। ওই অবস্থায়ও ওই লোকই প্রথম তার উপস্থিতি টের পেল। মুখ ফিরিয়ে একবার দেখল, উঠে দাঁড়াল—অই, তুই কে?

তিনজন মিল্লা মেয়েটারে ধরছেন ক্যান?

শখ হইছে তাই ধরছি।

ছাড়েন। ওরে যাইতে দ্যান।

লোক তিনজন একসঙ্গে হাসল, একজন বলল—চান্দু, তুমি কেডা?

ওরে ছাড়েন।

এই মাইয়া তুমার আত্মীয় লাগে? বউ? মা?

এত কথা বলেন ক্যান? এরে ছাড়তে বলতেছি ছাড়েন।

লোক তিনজন আবার হাসল—ভাগ নিবা?

তিন পর্যন্ত গুনমু...।

আরে, এইটা দেখি পাগল। অই হারামজাদা...।

এক...।

কালাম চাক্কুটা বাইর করত।

দুই...।

কালাম লম্বা একটা চাকু হাতে এগোতে আরম্ভ করল।

তিন...।

কালাম বলল—মাদানীর পুত, তরে আজ খাইছি।

প্রথম গুলিটা কালামকে করতে পারত দড়ি, কালামই ছিল সবচেয়ে কাছে। কালামকে বাদ দিয়ে সে পরপর দুটো গুলি করল একটু দূরে দাঁড়ানো দুজনকে। তাদের পা লক্ষ করে গুলি করল সে, এই আধো অন্ধকারে গুলি দুটো ঠিকমতো লাগল বলে খুশি খুশি লাগল দড়ির, এখনো তাহলে হাত পুরো ঠিক আছে!

ওদিকে কালাম ছুরি হাতে জমে গেছে। দড়ি বলল—থামলেন ক্যান, আসেন।

কালামের হাত থেকে ছুরি পড়ে গেছে, সে বলল—ওস্তাদ...।

দৌড় দ্যান। লম্বা দৌড় দিবেন। থামবেন না।

কালাম দৌড় দিতে নিল, দড়ি তখন গুলিটা করল, কালাম মাটিতে পড়ে গেল। দড়ি বলল—মুখ দিয়া একটা শব্দ বাইর করবেন তো কইলজা বরাবর গুলি করব। উইঠা দাঁড়ান, তিনজন তিনজনরে ধরেন, তারপর যান।

তিনজন ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে কিছুদূর গেলে দড়ি মেয়েটির দিকে তাকাল। মেয়েটা গুটলি পাকিয়ে গেছে। কাঁপছেও।

দড়ি বলল—আপনে বইসা আছেন ক্যান। আপনেও দৌড়ান।

মেয়েটা উঠতে গিয়ে পড়ে গেল।
বাড়ির রাস্তা চিনবেন?
মেয়েটা সামান্য মাথা ঝাঁকাল কি ঝাঁকাল না।
ওঠেন, রওনা দেন। এই বলে দড়ি আর দাঁড়াল না। সে ঢালু বেয়ে উঠতে আরম্ভ করল। গুলির শব্দ রাস্তার কিনারায় কিছু বিক্ষিপ্ত ভিড় জমিয়েছিল। দড়িকে উঠে আসতে দেখে সেই ভিড় কিছুটা সরে সরে গেল। একজন শুধু সাহস করে জিজ্ঞেস করল—কী ভাই, কী হইছে, বুঝলেন কিছু?
দড়ি বলল—বুঝছি। কিন্তু আপনেরে বলতে ইচ্ছা করতেছে না।
হাঁটতে হাঁটতে দড়ি টের পেল—সে আর অসুস্থ বোধ করছে না, শরীরও বেশ ঝরঝরে লাগছে।
বাড়ি ফিরলে তাকে দেখে বসন্তকুমার অবশ্য চমকে উঠল—আপনাকে অমন লাগে ক্যান?
কেমন লাগে?
মনে হইতেছে আপনেরে কাউয়ায় ঠোকরাইছে।
দড়ি তাকিয়ে থাকল বসন্তকুমারের দিকে।
রাগ করেন ক্যান! আপনেরে দেইখা যেইটা মনে হইতেছে, সেইটা কইলাম।
রাগ করছি কে কইল! আমি খুশি হইছি। আমারে কাউয়াই এহনো ঠোকরাইতেছে। বাইরে ঠোকরাইতেছে, ভেতরে ঠোকরাইতেছে।
গোছল যাইবেন?
যামু।...মাঙ্কি কই?
হেরে আটকায়া রাখছি।
আটকায়া রাখছ, বসন্ত, তোমার সাহস দেইখা টাস্কি খাইলাম।
আটকায়া না রাখলে উপায় কী! বড়ই ডিস্টার্ব দ্যায়।
তোমার চেহারা সুন্দর না, তাই সে তোমারে পছন্দ করে না। তোমার চেহারা সুন্দর হইলে দেখতা সে তোমারে কত পছন্দ করে। হয়তো সে বিবাহের প্রস্তাবও দিত।
তারে কি আপনার কাছে নিয়া আসব?
আনবা না ক্যান! মাঙ্কির লগে গল্প জমা হইয়া আছে।
সে কিন্তু একটু ডরাইছে।
দড়ির চোখ সরু হয়ে গেল—তুমি কিছু করছ?
আমি কী করব! আপনেই না তারে পিস্তল দেখাইলেন!
অ।...না, রাগ করে না। অভিমান হইছে ওর। ওরে আনো।
বসন্তকুমার পা বাড়াল।
দড়ি বলল—আমার গল্প কেউ বুঝে না। আমি নিজেও না। মাঙ্কি না থাকলে কি যে অসুবিধায় পড়তাম।

একটা খুন। সার্কাস ভাবল। একটা খুন এমন কী ব্যাপার। এই বাংলাদেশে আকছার খুন হচ্ছে। এত এত খুন, পুলিশ সব খুনের বিবরণ খাতায়ও তুলত পারছে না। এত সব খুনের সঙ্গে যদি আরেকটা খুন যোগ হয়, ওজন কি এতই বেড়ে যাবে যে সেই খুনের ভার বহন করা যাবে না? সহজ হিসাব বলে, ওই খুন আরো সব খুনের সঙ্গে মিলেমিশে যাবে, এর বাইরে আর কিছুই হবে না। সার্কাস হাসল—তাহলে দড়িকে কি ফালায়া দিব?
কিছুক্ষণ ভাবল সার্কাস। তার মনে হলো, যদিও কাজটা বেশ কঠিন, তবে তক্কে তক্কে থাকলে দড়িকে সে ফেলে দিতেই পারে। তারপর?
তারপর কিছুই না। সার্কাস বলল।
তাহলে তর্কে তর্কে থাকব আমি? কী বলেন ভাইজান?
থাকতে পারো। কিন্তু তুমি যা চাও তা কি পাবে?
ভাইজান, দড়ি না থাকলে, তারপরই আমি। অটোমেটিক চয়েস বইলা একটা কথা আছে।
আতিকুজ্জামানরে বোকা ভাইব না।
এইটাও কথা।
ধরো, সে বুইঝা ফেলল দড়িকে তুমিই সরাইছ...।
তাইলে আমারেও সে নিব না।
ঠিক।
তাইলে?
অপেক্ষা।
ওয়েটিং ভালো লাগে না ভাইজান।
সবুর সবুর।
ধরেন, এই সবুরে মেওয়া ফলল না।
কিসে মেওয়া ফলব, তুমি জানো না। মাথা ঠাণ্ডা রাখো।
রাখলাম। অল্প দিনের জইন্য রাখলাম। কিন্তু...।
কিন্তু কী?
বড়ই মন চায় একখান সার্কাস শুরু হোক।

তুমি দূর থেকে হেঁটে আসছিলে না? কায়সার বলল। তোমাকে কি যে সুন্দর লাগছিল!
নাজিয়াকে আজ সত্যিই রোজকার তুলনায় বেশি সুন্দরী লাগছে। তার চেহারায় গভীর এক মায়া আছে। তার উজ্জ্বলতা বা অন্য যেকোনো কারণে হোক সেই মায়া সব সময় চোখে পড়ে না। আজ সেই মায়া প্রবল হয়ে উঠেছে। কায়সার অপলক তাকিয়ে থাকল তার দিকে। নাজিয়া তার দিকে কায়সারের তাকিয়ে থাকা লক্ষ করল কিছুক্ষণ, তারপর ছোট হাতব্যাগ খুলে কিছু একটা খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। হতাশ গলায় বলল, পাচ্ছি না।
কী?
পিন।
পিন!
তোমার দুচোখ গেলে দেব।
একসময় একটা গান খুব পপুলার ছিল, আমাদের মা-বাবার আমলে 'কী নামে ডেকে বলব তোমাকে, মন্দ করেছে আমারে এই দুটি চোখে।' শুনেছ?
ছুঁচো, আমি যদি সত্যিই তোকে...।
চুমু খাবে? সত্যিই?
ছুঁচো না ছুঁচো না, তুই খাটাশ, খাটাশ। কিংবা ওই দুটো মিলে যা হয়, তা-ই।
ছুঁচোর ছুঁ আর খাটাশের খা। ছুঁখা।
কয়সার শোনো, তুমি সত্যিই গত রাতে আমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছ।
শোনো সোনা, এত রাগ করার মতো কিছুই আমি করিনি।
তুমি বললে, তুমি একটা কথা বলবে। বললে, তোমার মা খুব রাগ করেছে তোমার ওপর। বললে, তুমি আমাকে বলবে কেন তিনি রাগ করেছেন।
হ্যাঁ, বলব। বলব না, তা কি বলেছি?
ছুঁচো, খ্যাপাবে না আমাকে।
এখন বলব কাকাতুয়া।
রাতে বলোনি কেন?
ওটা ঠিক টেলিফোনে বলার মতো না।
তাহলে কিছুই আমাকে বলার দরকার ছিল না। সারা রাত আমার চিন্তায় কাটল।
চিন্তায় কেন কাটবে!
আমি ভাবলাম, উনি বোধ হয় আমার কোনো ব্যাপারে রাগ করেছেন।
তাহলে আপাতত কিছুই বলতাম না।
তারপর চেষ্টা করতে কিভাবে আমার সঙ্গে সম্পর্ক নট করা যায়?
এসব কথা বলবে না কাকাতুয়া। এসব বাজে কথা।
তোমার উচিত হয়নি ছুঁচো। তখনই তোমার বলে ফেলা উচিত ছিল।
মুখোমুখি না বললে তুমি বুঝবে না... তোমার বুঝতে অসুবিধা হতো।
কী এমন ব্যাপার সেটা?
আমার বাবাকে নিয়ে। কায়সার বলল। কাকাতুয়া, কথাটা আমার বাবাকে নিয়ে।
নাজিয়া চোখ বন্ধ করে তাকাল কায়সারের দিকে। তাকে দেখে মনে হলো, সে বোঝার চেষ্টা করছে কায়সার কী ধরনের কথা বলবে। সে বুঝতে পারল না, তোমার বাবা সম্পর্কে তুমি আমাকে কখনো কিছু বলোনি।
বলিনি কাকাতুয়া। তুমিও জানতে চাওনি।
আমি কী জানতে চাইব?
তা-ও ঠিক।
তোমার বাবা তোমার ছোটবেলায় মারা গেছেন, এটুকু তুমি বলেছ। এরপর আমার আর কী জানার থাকতে পারে!
আমাদের একটা সম্পর্ক আছে, সেই সম্পর্ক একটা পরিণতির দিকে এগোবে—এখন জানানো দরকার।

নাজিয়া হাসল, সে জন্য জানাবে?

জানানো দরকার।

তুমি জানানোর যে কারণ বললে, সেটা ধরলে—সম্পর্ক শুরুর আগেই জানানো উচিত ছিল।

আহা, তর্ক জুড়ে দিলে।

আমি যুক্তির কথা বলছি ছুঁচো।

শোনো কাকাতুয়া, বিষয়টা বড় ধরলে বড়, মানে আমি আমার বাবা সম্পর্কে যা বলব, আবার না ধরলে কিছু না। কিছু না এই অর্থে, উনি মারা গেছেন বহু আগে। এখন কেউ আর অতীত ঘাঁটতে যাবে না।

তাহলে আর জানানোর দরকার কী?

আম্মা বলেছেন, সব কিছু জানিয়ে রাখতে।

উনি না বললে জানাতে না?

আসলে আমার মাথায়ই আসেনি ব্যাপারটা।

খাটাশ...। 'খাটাশ' বলে চুপ করে থাকল নাজিয়া।

ম্যাডাম, কিছু বলবেন মনে হলো।

দেখো, আমিও কিন্তু আমার বাবা সম্পর্কে কিছু বলিনি।

আমি জানি উনি ব্যবসা করেন। তুমিই বলেছ।

এর সঙ্গে আরো কিছু বলার থাকতে পারে।

কায়সার হাসতে আরম্ভ করল—এ এক আজব ব্যাপার শুরু হলো।

বংশ পরিচয় নিয়ে বসতে হবে।

হ্যাঁ, ভালো বংশের কুকুরের মতো।... আমাদের কুকুর জীবন।

হয়েছে। আমাদের কুকুর জীবন না, আমাদের মানুষ জীবন।

এখন কি আমরা আমাদের মানুষ জীবন নিয়ে কথা বলব?... কাকাতুয়া, আম্মা আমাকে আরেকটা কথা বলেছেন। আমাদের বিয়ে নিয়ে...।

আশ্চর্য, এ রকম একটা খবর তুমি এতক্ষণ বলোনি!

বলিনি। কারণ তোমাকে বিয়ে করব কি না, সেটা এখনো ফাইনাল করিনি।

নাজিয়ার আসলে হাসিই পাচ্ছে। কায়সার যখন বলল সে তার বাবা সম্পর্কে জানাবে, তখন নানারকম ভেবেছিল সে, এ রকম কিছু ভাবেনি। জেনে অবশ্য তার বিন্দুমাত্র মন খারাপ হয়নি, হওয়ার কোনো কারণও নেই, সে ভেবে দেখেছে, কিন্তু হাসিটুকু সে চেপে রাখতে পারছিল না। কায়সার যখন আরম্ভ করল, তখন থেকেই। কায়সার আরম্ভ করেছিল খুব ভণিতা করে—কী করে তোমাকে বলি!

সে বলেছিল—যেভাবে কথা বলো, আমার সঙ্গে সেভাবেই বলো। ভাব নিতে হবে না।

ভাব না। ব্যাপার আছে...।

ব্যাপার আসলে কিছুই না। কায়সার জানাল, তার বাবা ছিল পুরনো ঢাকার নামকরা মাস্তান। তাকে একনামে চিনত সবাই, জমা-খরচও দিত। তবে অনেক সময় মাস্তানদের ভাগ্য যা ঘটে, সে রকমই ঘটেছিল কায়সারের বাবার ক্ষেত্রে। প্রবল প্রতাপ, রাজনীতিবিদদের নৈকট্য, পুলিশের সঙ্গে সখ্য—এত কিছুর পর গুলি খেয়ে মারা যেতে হয়েছিল তাকে। ছোট ছোট কয়েকটি দল তাকে অনুসরণ করেই যাচ্ছিল, তারপর এক দুপুরে সুযোগ পেয়ে গুলি করল তারা, ঘিরে দাঁড়িয়ে কাছ থেকে গুলি, এসব পরে প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ থেকে শোনা, গুলির পর মৃত্যু নিশ্চিত করে লাশ ভাসিয়ে দিয়েছিল বুড়িগঙ্গায়। বুড়িগঙ্গা তখন এখনকার মতো মরা নদী না, আবার খরস্রোতাও না, তার মৃতদেহ আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

বলতে বলতে কায়সারের গলা কি একটু ধরে এসেছিল? ঠিক বুঝতে পারছিল না নাজিয়া, হয়তো তার ও রকম মনে হচ্ছিল কিংবা কায়সার সত্যিই একটু নরম হয়েছিল। নাজিয়া হাত রেখেছিল কায়সারের কাঁধে।

কায়সার বলেছিল—তুমি কি ভাবছ আমার মন খারাপ হয়েছে?

বুঝতে পারছি না।... হয়েছে?

আমিও বুঝতে পারছি না। এখানে আসলে দুটো ব্যাপার। এক, বাবার কোনো স্মৃতি নেই, আমি তখন খুবই ছোট, কয়েক মাসের...।

হুঁ...।

সুতরাং মন খারাপ হওয়ার কথা আমার না। যেই লোককে দেখিইনি আমি, তাকে নিয়ে কি কষ্ট হয়, মন খারাপ করে?

হ্যাঁ, তার পরও উনি আমার বাবা। ওনার কথা খুব একটা মনে হয়, এমন না। সত্যি কথা বলতে কি, মনে হয়ই না। কিন্তু এই এখন মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, উনি বেঁচে থাকলেও পারতেন।

আমি স্যরি সোনা।

স্যরি হওয়ার কিছু নেই।

আমার আসলে আরেকটা কারণে হাসি পেয়েছিল।

নাজিয়ার এই কথা শুনে কায়সার খুব অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, সে বুঝতেই পারছে না, এর মধ্যে হাসির আর কী কারণ থাকতে পারে। সে ক্ষীণ গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, আমার বাবা ও রকম মাস্তান ছিল শুনে তোমার হাসি পাচ্ছে?

পাচ্ছে না। পাচ্ছিল। ওই কারণে হঠাৎ একটু হাসি পেয়েছিল।

একটু ম্লান হয়েছিল কায়সার—আসলে বাবা অমন এক মাস্তান ছিল...।

ও কারণে না। কী কারণে, সেটা তোমাকে একটু পরে বলব। তুমি বলো।

কায়সার আবার বলতে আরম্ভ করেছিল। তার অবশ্য বলার মতো আর কিছু ছিল না। বাবাকে দেখেনি মনে রাখার মতো করে, ফলে বাবা না থাকার জীবনেই সে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তবে তার খেয়াল আছে তার মায়ের কথা।

তুমি কল্পনাও করতে পারবে না আমার মা কতটা সাহসী মহিলা।

বোঝা যায়। আমি একদিন দেখেছি, ওটুকু সময়েই বুঝেছি।

আর আমি এত বছর ধরে দেখছি। যেমন সাহস, তেমন মাথা ঠাণ্ডা।

আর তোমাকে খুব ভালোবাসেন, না?

কায়সারের চোখ হঠাৎই ভিজে উঠেছিল, সে তাকাতে পারছিল না নাজিয়ার দিকে, সে অন্যদিকে তাকিয়ে বলেছিল—এটাও বুঝে ফেলেছ?

আজ না, বুঝেছি অনেক আগেই।

চোখে-মুখে ফিরে তাকিয়েছিল কায়সার, তার চোখে সামান্য বিস্ময় ছিল।

বুঝব না! তুমি যেভাবে ওনার কথা বলো।

আম্মা আমার সব।

আমি জানি।

আমি সব পারব, শুধু আম্মার মনে কখনো কষ্ট দিতে পারব না।

নাজিয়া মৃদু গলায় বলেছিল হুঁ, এটাও জানি।

আমার মাঝেমধ্যে কী মনে হয় জানো? আমি একটা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি। রাস্তা আমার ডান দিকে বাঁ দিকে দুদিকেই চলে গেছে। ওই দুদিকের একদিকে তুমি। আরেকদিকে আম্মা।

নাজিয়া ভেতরে ভেতরে চমকেছিল। এটা কী ধরনের কথা! রাস্তার দুদিকে দুজন, কায়সার তাহলে কোনদিকে যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করবে! কথাটা পছন্দ হয়নি নাজিয়ার। তার মনে হয়েছিল, তবে কি কায়সারের যাত্রা সব সময় পরস্পর বিপরীত?

কায়সার বলেছিল—কিন্তু আমি ঠিক ঠিক জানি একটা ব্যাপার...।

বলার সময় কায়সারের মুখে হাসি ছিল। এই হাসি নাজিয়াকে স্বস্তি দিচ্ছিল না। সব হাসি স্বস্তির কারণ হয় না, এটা বোঝার বয়স অনেক আগেই তার হয়েছে। কায়সার তাকিয়েছিল নাজিয়ার দিকে—কিন্তু আমি ঠিক ঠিক জানি, আমি যেদিকেই যাই, ডানে কিংবা বাঁয়ে, এগোতে এগোতে আমি তোমাদের দুজনকেই পাব।

বলে হাসি মুখে কায়সার নাজিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকল। সে সম্ভবত নাজিয়ার মুখেও কিছু হাসি আশা করেছিল, এটা বুঝতে পেরে নাজিয়া কিছুটা হাসল বটে, যদিও সেটা উজ্জ্বল দেখাল না, তবু হাসিটা সে ধরে রাখার চেষ্টা করল, একটু একটু করে ম্লান হলো বৈকি। উঠে যাওয়ার আগে সে বলল, আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি তোমাকে?

করো। হৃদয়ের এ-কূল ও-কূল দুকূল ভেসে যায়... জিজ্ঞেস করো, আজ তোমাকে সব বলে দেব। মানে, এর আগে তুমি আমাকে সব বলতে না!

সেদিন পলিটিক্যাল সায়েন্সের একটা মেয়েকে খুব পছন্দ হলো, এটা তোমাকে বলা হয়নি।

অন্য সময় হলে, 'ওরে ছুঁচো, ওরে ছুঁচো' বলে ঝাঁপিয়ে পড়ত নাজিয়া। তখন ব্যাপারটা মাথায় খেললই না, নাজিয়া বলল তোমাকে বলি, হ্যাঁ।

সে বলল বটে, বলি, হঠাৎ আবার বলতে তার দ্বিধাও হলো। এভাবে বলা কি উচিত হবে? এভাবে বললে নিজেকে ছোট করে ফেলা হবে? যদি তার কথা শুনে কায়সার তাকে বুঝতে না দিয়ে ভেতরে ভেতরে হাসে! নাজিয়া মনস্থির করতে না পেরে অসহায় বোধ করল।

কী হলো? বলো।

দ্বিধাটুকু হঠাৎই কাটল, নাজিয়া বলল—আমাকে ওনার খুব কি অপছন্দ হয়েছে?

খুব না। কিছুটা।

কী বলতে চাও?

তোমার বুদ্ধি কমে গেছে...।

কোনো সময়ই ছিল না।

তোমার বুদ্ধি কমে গেছে, কারণ তুমি এই সাধারণ ব্যাপারটাই বুঝতে পারছ না—যদি উনি তোমাকে অপছন্দই করতেন, তবে এতসব তোমাকে জানিয়ে দিতে বলতেন না।

হুঁ।

এ কথা তুমি জিজ্ঞেসই বা করলে কেন! তুমি কি অপছন্দ হওয়ার মতো মেয়ে?

একেকজন একেকভাবে দেখেন।

আম্মা দেখেন সাদা চোখে।... তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি, সেটা বললে তুমি বুঝবে, আম্মা কিভাবে দেখেন। মানে তার দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারটা।

বলো।

আম্মা বিশ্বাসকে খুব বেশি মূল্য দেন। পারস্পরিক বিশ্বাসকে।

একটু বুঝিয়ে বলো।

দুজনের প্রেম ভেঙে যেতেই পারে।... দাঁড়াও, ভেঙে যেতেই পারে, তাই না? আমরা চারপাশে এ রকম কত দেখছি। ধরো...।

তোমার আম্মা কী বলেছেন, সেটা বলো প্লিজ।

আম্মা বলেছেন, তুমি আমার ওপর যে বিশ্বাসটা স্থাপন করেছ, সেটা যেন আমি নষ্ট না করি। আমাদের সম্পর্ক যেন কখনো আমার দোষে বা আমার কারণে নষ্ট না হয়।

নাজিয়ার মুখে হাসি ফুটল ধীরে, তবে হাসিটা থেকে গেল—উনি বলেছেন?

কাকাতুয়া, আম্মা বলেছেন।

কী সুন্দর কথা।

এখন তুমি যদি তোমার বিশ্বাস ভাঙো, সেটা তোমার ব্যাপার।

ছুঁচো, আমি তোমাকে একটা কথা বলি এখন?

বলো।

তোমার মা তোমার বাবাকে খুবই ভালোবাসতেন। এত বছর হয়ে গেছে, আমার ধারণা, এত বছরেও ওনার ভালোবাসা একটুও নষ্ট হয়নি।

নাজিয়ার ভেতর জেদ আছে, এটা কায়সার জানে, না দেখালেও সেদিন এই জেদের ব্যাপারটুকু তার মা-ও টের পেয়েছেন, যদিও কায়সারের মনে হয়, জেদ যেটুকু আছে নাজিয়ার, সেটা কিছুটা ছেলেমানুষি টাইপের, এমন হতে পারে, প্রয়োজনে কোনো সময় সে নাজিয়ার সিরিয়াস টাইপ জেদ দেখবে, তবে আপাতত তার ধারণা, নাজিয়ার ভেতর অন্যরকম একটা ছেলেমানুষি আছে।

নাজিয়া প্রায় ডানা ঝাপটে উঠেছিল তখন—আরে দাঁড়াও দাঁড়াও।

আমাকে বলতে দাও। এসব তোমার জানা দরকার।

আহা, তখন হাসছিলাম না, সেই কারণটা বলব।

কায়সার তখন আগ্রহ দেখাল।

নাজিয়া বলল, আমার বাবাও মাস্তান।

কায়সার হেসে ফেলল—তাই? মাস্তান?

হাসবে না, হাসলে আমার বাবাকে লাগিয়ে দেব তোমার পেছনে। তোমার লাইফ হেল হয়ে যাবে।

তুমি পাশে থাকলে সেটা নতুন করে হবে বলে মনে হয় না।

কী!

কিছু না। তুমি বলছিলে তোমার বাবাও মাস্তান। এটা কি

আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বললে?
না। এই কথাটা সত্য।
কায়সারকে হতাশ দেখাল–খামোখা একটা কথা বলে দিলে! তুমি বলেছ, তোমার বাবা ব্যবসায়ী।
হ্যাঁ।
তাহলে?
সত্যি বলি। আমার ধারণা, আমার বাবা সত্যিই মাস্তান ছিলেন একসময়। এখনো হঠাৎ হঠাৎ বাসায় অদ্ভুত চেহারার মানুষ আসে।
আশ্চর্য! আসতে পারে না?
পারে।... কায়সার, আমি অনুমান করে বলছি। নির্দিষ্ট করে জানি না, উনি মাস্তান ছিলেন কি না। বাবাকেও এটা জিজ্ঞেস করা যায় না, মাকেও না। আসলে কাউকেই জিজ্ঞেস করা যায় না। কিন্তু তুমি জানো, আমার অনুমান-শক্তি ভালো। এই অনুমান-শক্তি আর মাঝেমধ্যে এদিক-ওদিক থেকে কানে পৌঁছে যাওয়া কিছু কথা–এই দুই মেলালে মনে হয়, আমি যা বলছি তা ঠিক। এককালে ছিলেন, তারপর টাকা-পয়সা বানিয়ে সরে এসেছেন, আমার ধারণা ব্যাপারটা এ রকম।
কায়সার হেসে ফেলল–বেশ হলো। আমার বাবা তোমার বাবা, দুজনই।
তবে একটা কথা, বাবাকে কিন্তু আমি খুবই ভালোবাসি।
বাবাকে ভালোবাসবে না কেন!
তুমি তোমার মাকে যতটা ভালোবাস, আমিও আমার মাকে ততটা।
কোনো সমস্যা নেই।
আর বাবাও আমাকে কী যে ভালোবাসে, যদি বলি, একঘন্টা এখানে দাঁড়িয়ে থাকো, নড়বে না–তবে তা-ই করবে।
চমৎকার।
এটা তোমার জন্য কেন চমৎকার হবে!
আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে তোমার বাবা তাহলে কোনোই আপত্তি করবেন না।
তোমার কি ভয় ছিল এটা নিয়ে?
নাজিয়ার এই প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারেনি কায়সার। সে হেনতেন করে এড়িয়ে গেছে। কী উত্তর দেবে সে, কোনো উত্তর তার নিজের কাছেও নেই।
ঠিক ভয় হয়তো নয়, একটা অস্বস্তি ছিল তার। এই অস্বস্তি তৈরি হয়েছিল নাজিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ার বেশ পরে। প্রথম প্রথম এসব কিছুই মাথায় আসে না। তারপর দিন যায়, কথা হয়, দুজন দুজন সম্পর্কে যেমন জানে, দুজনের পরিবার সম্পর্কেও কিছু কিছু জানে। তখন কিছু কিছু বিষয় স্পষ্ট হতে থাকে, তখন কিছু কিছু পার্থক্য কিছুটা দ্বিধায় ফেলে।
কায়সারের দ্বিধাটা ছিল সামাজিক অবস্থান নিয়ে। তাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ, তা না। উচ্চবিত্ত না তারা, আবার নিম্ন মধ্যবিত্তও না। তারা মধ্যবিত্ত, এই ব্যাপারটা কোনো সময় বড় হয়ে উঠবে না তো–এই ভাবনাটা মাঝেমধ্যে কায়সারের হয়েছে, তার মনেও হয়েছে, নাজিয়াকে সে জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু সব কিছু কি জিজ্ঞেস করা যায়! জিজ্ঞেস করতে গেলে নাজিয়া যদি অবাক গলায় বলে–তোমার এ রকম মনে হলো!
তখন কী উত্তর দেবে সে? তখন–হ্যাঁ... মানে... এই তো... ধরো, এটা মাথায় আসতেই পারে–এ জাতীয় কিছু বলতে হবে। সে বলা কতটা বলার মতো শোনাবে, কায়সারের সন্দেহ ছিল।
আজও সে তাই নাজিয়ার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েছিল, বলেছিল না না, ভয় কেন!
আমিও তাই বলি।
একটা দ্বিধা ও অস্বস্তি তবু কাজ করছিল। সে বলেছিল–আচ্ছা, নাজিয়া, আমার কথা কি তোমাদের বাসায় জানাবে?
কী জানাব? তুমি একটা খাটাশ, এটা?
আহা, এই যে আমাদের সম্পর্ক...।
নাহ...।
বলোনি!
কায়সার, বলিনি বলে তুমি এত অবাক হচ্ছ কেন!
আমি আম্মাকে বলেছি।
সেটা আমিও বলতে পারতাম, বাবা-মা দুজনকেই। কিন্তু এটা আমার কাছে আগবাড়িয়ে বলার যেমন কিছু না, তেমনি লুকিয়ে রাখার মতোও কিছু না।
তবু।... আমার মনে হয় জানিয়ে রাখাই ভালো।
জানাব।... তুমি বাসায় যাবে আমাদের।
এত দিনেও যাইনি, এটা ভাবলেই আমার অবাক লাগে।
সত্যিই তো।... আরে, সত্যিই তো। যাওনি কেন!
আশ্চর্য, তুমি নিজে একবারও বলোনি, এখন আমাকে জিজ্ঞেস করছ!
এখন বললাম। কবে যাবে?
যাব।

বাড়ি ফিরে কায়সার এটা নিয়ে মায়ের সঙ্গে কথা বলেছিল, এই যে নাজিয়া তাকে তাদের বাসায় যেতে বলেছে। শুনে নাদিরা বেগমও অবাক–তুমি এত দিনেও যাও নাই!
এইবার যাব।... আম্মা, আমাদের সময়টা বদলে গেছে।
কী রকম?
আমাদের শুধু আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়। যেমন ধরো 'ক'-এর সঙ্গে 'খ'-এর বন্ধুত্ব। খুবই ভালো বন্ধুত্ব। কিন্তু ক জানে না, খ-এর বাড়ি কোথায়, খ জানে না ক-এর টা। বাসায় যাওয়া দূরের কথা।
শুনে নাদিরা বেগম মুচকি হেসেছিলেন।
তারপর ধরো, ক জানে না খ-এর বাবা-মার কথা বা তারা ভাই-বোন কয়জন...।
নাজিয়ারা কয় ভাই-বোন?
এইটা জানি। কায়সার হেসে ফেলেছিল। ও একাই।
পরিবেশ যখন এ রকম, তরল ও আন্তরিক, তখন কথাটা তুলেছিল কায়সার–ধরো এইবার তো ওদের বাসায় যাব।
যাও। যাওয়া উচিত। দেখবা না বাসাটা কেমন?
বাসা কী দেখব আম্মা!
বাসা কি শুধুই বাসা? এ রকম ক্যান ভাবতেছ! বাসা দেখা মানে অনেক কিছু দেখা।
বুঝেছি।... আম্মা, আমি ঠিক করেছি, জিজ্ঞেস করলে, জিজ্ঞেস তো করবেই, তখন আমি আব্বার ওই পরিচয় দেব না।
দিবা না? জিজ্ঞেস করে নাদিরা বেগম বেশ কিছুক্ষণ ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। এমন ভাবে তাকিয়ে থাকলেন, কায়সার কিছু বলার সুযোগ পেল না। নাদিরা বেগম বললেন–দিবা না?... আচ্ছা দিও না। ওইটা পরিচয় দেওয়ার কিছু না।
জিজ্ঞেস করলে অন্য কিছু বলব।
কী বলবা?
এখনো ঠিক করি নাই।
বইলো, তোমার আব্বা তোমার ছোটবেলায় বিদেশ চইলা গেছে, তারপর আর ফিরে নাই।... সহজে বিশ্বাস যায়, এমন কিছু বইলো, আবার তোমার যেন সম্মানও না কমে...। আসলে তার যে মৃত্যু হইছে, এইটাই জানানো দরকার।
কিন্তু সমস্যাও আছে আম্মা, ধরো কবরের কথা উঠল।
বলবা বিদেশে মৃত্যু হইছে তার।... আচ্ছা, এইটা এই এখনই ঠিক করার দরকার নাই।
হ্যাঁ, একটু ভেবে দেখি। তোমাকে জানাব।
একটা ব্যাপার নিয়া খারাপ লাগতেছে বাপ। একটা সংসার করবা তুমি... তোমরা একটা সংসারের কথা ভাবতেছ, বাপ, সংসার খুব পবিত্র জায়গা... এই সংসারের মধ্যে তোমরা একটা মিথ্যা রাখবা!
মিথ্যা।
এই যে, তোমার আব্বার কথা বাপ। এই একটা মিথ্যা তোমার জীবনে থাকতেছেই। নাদিরা বেগম কায়সারের দিকে তাকালেন। হাসলেন একটু–থাকুক। কিছু কিছু মিথ্যা আছে বাপ, যদিও কঠিন মিথ্যা, একসময় সেই মিথ্যার তেজ থাকে না, একসময় সেই মিথ্যারেই সত্য বইলা ধারণা হয়, তুমি এইটা নিয়া ভাইব না বাপ। সব মিথ্যাও মিথ্যা না।

আতিকুজ্জামানের মন আজ সকাল থেকেই ভালো। সকালে সে যখন ট্রেড মিলে উঠেছে, তখন থেকেই। ট্রেড মিল থেকে নামার পর তার পুরো শরীরে ঘাম, কিছুটা সাময়িক ক্লান্তি, এর মধ্যেও টের পেল, আতিকুজ্জামান টের পেল তার মন ভালো। রহস্য কী–তার একবার মনে হলো।
কমলার জুস নিয়ে এসেছে যে লোকটা, তার নাম মনে নেই

আতিকুজ্জামানের, সে জুসের গ্লাস নিতে নিতে জিজ্ঞেস করল—কী যেন নাম তোমার?

কাদের, স্যার।

গুড মর্নিং কাদের।

জি স্যার।

কী 'জি'? জিজ্ঞেস করে কতক্ষণ তাকিয়ে থাকল কাদেরের দিকে, তারপর হাত নেড়ে তাকে বিদায় করল আতিকুজ্জামান। জুসে চুমুক দিতে দিতে সে আবার তার মন ভালো থাকার কারণ নিয়ে ভাবনায় পড়ল। তার একবার মনে হলো, এটা নিয়ে নাজিয়ার সঙ্গে কথা বললে একটা সমাধান পাওয়া যেতে পারে। নাজিয়ার কাছে প্রায় সব সমস্যার সমাধান আছে। এই সেদিন সে মাথা চুলকাতে চুলকাতে নাজিয়ার কাছে গিয়ে বলল—মা, খুব বড় ধরনের সমস্যায় পড়ছি।

বাবা, তুমিও সমস্যায় পড়ো!

এইটা খুব বড় ধরনের। একজন আমারে একটা ধাঁধা দিল, তার আগামাথা কিছুই বুঝতেছি না।

তুমি এখন রবীন্দ্রনাথ বোঝো, একটা সাধারণ ধাঁধা না বুঝলে চলবে! বলো, কী ধাঁধা।

একজন লোক বলল—আমি সব সময় মিথ্যা কথা বলি। এখন আমাকে বলতে হবে, এই লোকটা সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী।

তুমি কী বললে?

প্রথমে বললাম, সে সত্যবাদী, কারণ সে তো স্বীকারই গেল মিথ্যাবাদী। যে লোক জিগাইছিল, সে বলল হয় নাই, তারপর...।

বাবা, তুমি বললে লোকটা সত্যবাদী। তা লোকটা যদি সত্যবাদীই হবে, তাহলে এই যে সে বলল— 'আমি সব সময় মিথ্যা কথা বলি'—তার এই কথাটা মিথ্যা হয়ে গেল না?

কিছুক্ষণ ভাবল সে, তারপর বলল—এইবার বুঝছি, সে মিথ্যাবাদী।

তাহলে তার এই কথাটাও মিথ্যা, 'আমি সব সময় মিথ্যা কথা বলি।' তাহলে সে মিথ্যাবাদীও না।

আরে, সে জন্যই বলছিলাম সে সত্যবাদী... ধ্যাৎ, এইটা কী কিছুই বুঝতেছি না।

বাবা, এটা তুমি বুঝবে না। এটা কেউ বুঝবে না। ওই লোককে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী কিছুই প্রমাণ করা যাবে না।

শুনে খুবই হতাশ বোধ করেছিল সে—এইটা একটা কথা হইল।

এটাই কথা। তোমার ওই লোককে জিজ্ঞেস করো, সেও জানে না। এ রকম আরো কিছু ধাঁধা আছে, যেগুলোর কোনো জবাব নেই।

তোর কাছে আছে? তুই জানস?

আছে। কায়সারের কাছেও অনেক।

অ।... দিস তো আমারে। যে আমারে ওইটা জিগাইছিল, তারে দিমুনে।

এটা কয়েক দিন আগের কথা। এখন নাজিয়ার কাছে গেলে কোনো সমাধানই পাওয়া যাবে না, বরং সে হয়তো এমন চোখে তাকাবে, তার খবর হয়ে যাবে। মেয়ে রেগে আছে তার ওপর। দোষ, এক অর্থে তারই। মেয়ে যদিও সব দোষ তার ওপর চাপিয়ে দিয়ে বসে আছে। হয়েছে কী—নাজিয়া তার বন্ধু কায়সারকে নিয়ে এসেছিল। এমন না লুট করে নিয়ে এসেছিল, বলে-কয়েই নিয়ে এসেছিল। সে জানত, কায়সার নামের ছেলেটা অমুক দিন অমুক সময় আসবে। সে অপেক্ষাই করছিল। মেয়ের পছন্দ কতটা ঠিক, বিবেচনা কতটা বুঝদারের মতো, এসব তার দেখতে হবে বৈকি। কিন্তু হলো কি, ওই ছেলে আসার আগে জরুরি ফোন এল তার। খুবই জরুরি। তখনই তাকে যেতে হবে, বহু কষ্টে সময় বের করা গেছে, এখন যদি সে না যায়, তবে যে লোককে সে এই কাজে নামিয়েছিল, বলল, পরে আবার কবে দেখা করার ব্যবস্থা করা যাবে, তার ঠিক নেই।

শুনে তার খবর হয়ে গেল। খবর যদিও হলো, নাজিয়াকে জানানো গেল না। তার অস্থিরতা বাড়ল ও বাড়তেই লাগল। নাজিয়া জিজ্ঞেস করল—তুমি অমন করছ কেন!

নার্ভাস নার্ভাস লাগে।

মিথ্যা। আমাকে মিথ্যা বলবে না।

কিন্তু সত্যিটাই বা সে বলে কী করে! সে জানে, নাজিয়া তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখবে—মজা পেয়েছ, না? কায়সারকে দাওয়াত দিয়ে আনানো হয়েছে, আগে থেকে জানো তুমি, আর এখন কিনা তোমার জরুরি কাজ পড়েছে।

ওদিকে ওই লোকের ফোন আসতেই লাগল আর সে বলতে লাগল—আর একটু, আর একটু। ফাঁইসা গেছি, ঝামেলায় পড়ছি...।

শেষে এমন হলো, কায়সার যখন এসে পৌঁছাল, ওই লোক জানাল আর অপেক্ষা করা যাবে না। যদি এমন হতো, যে লোকের সঙ্গে দেখা করার একটা সুযোগ পেয়েছে সে তার সঙ্গে দেখা না করলেও চালিয়ে নিতে পারবে না, সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হতো। কিন্তু ওটা চালিয়ে নেওয়ার ব্যাপার ছিল না, ওটা ছিল তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য জরুরি, হয়তো দেখা এইবার না করতে পারলে তাকে পিছিয়ে যেতে হবে বেশ অনেক দিন। সুতরাং যে ফোন করছিল বারবার, তাকে সে জানাল, সে ১০ মিনিটের মধ্যে রওনা দিচ্ছে।

এই ১০ মিনিটের মধ্যে কায়সারের সঙ্গে কী আর কথা বলা যায়। নাম জানা সত্ত্বেও আবার জিজ্ঞেস করা—কী নাম, বাবা-মা কেমন আছেন—বাবা নেই! খুব দুঃখের কথা—এসব বলতে বলতেই সময় শেষ। সে বলল—'তুমি বসো তো বাবা, আমার খুবই জরুরি একটা কাজ পড়ে গেল হঠাৎ, নাজিয়া, গল্প কর তোরা, তোর মা কই, আমি এই যাব আর আসব...।' বলে সে তড়িঘড়ি রওনা দিল। ফিরতে পারল দুই ঘণ্টা পর। ততক্ষণে কায়সার চলে গেছে। এ রকম আশঙ্কা সে করেছিল বটে। নাজিয়াকে দেখতে পেল না, তার ঘরের দরজা বন্ধ। এই আশঙ্কাটা আরো বেশি ছিল। সে নাজিয়ার ঘরের দরজায় টোকা মারতে গিয়ে মারল না, লাভ হবে না, তার জানা আছে, সে তাদের বেডরুমে এসে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল—আমি এইটা একটা কাম করলাম!

নাজিয়ার রাগ ভাঙাতে সময় লাগল।

আরে, তোর বাপে একটা ঝামেলায় পড়ছে, এইটা তুই দেখবি না?—এই কথা সহানুভূতি তৈরি করতে পারে ভেবে খুব আন্তরিক গলায় বলে কোনো লাভ হয়নি।

ঠিক আছে, এইবার গল্প হয় নাই, সমস্যা নাই, আবার আইতে বল, সকালে আইব রাতে যাইব—নাজিয়া এ কথাকেও গুরুত্ব দেয়নি।

শেষে যে কথায় নাজিয়ার মুখ উজ্জ্বল হয়েছে, সেটা হলো—কায়সার পোলাটা দেখতে বড়ই হ্যান্ডসাম। নাজিয়ার মা, তুমি খেয়াল করো নাই?

তখন তারা তিনজন সকালের নাশতার টেবিলে। অন্যান্য কিছু টুকটাক কথার পর আতিকুজ্জামানের এই কথা ও আড়চোখে নাজিয়ার দিকে তাকানো।

এই আড়চোখে তাকানো নাজিয়া টের পেয়ে গেল—বাবা, তুমি কি ইদানীং নিজেকে বেশি চালাক ভাবতে আরম্ভ করেছ?

আতিকুজ্জামান একটু বোকা বোকা ভাব নেওয়ার চেষ্টা করল—আমি আবার কী করলাম?

আমাকে পামপট্টি দাও, না? তুমি কি ভেবেছ আমি এখনো সেই বাচ্চা?

কী আশ্চর্য, কায়সার পোলাটা এক নাম্বার হ্যান্ডসাম, এইটা ভুল কিছু বলছি?

নাহ, মোটেও ভুল বলোনি। কায়সার খুবই হ্যান্ডসাম, খুবই সুন্দর একটা ছেলে। প্রায় তোমার মতো সুন্দর। হয়েছে?

তুই তো বলছিলি পড়াশোনায়ও দারুণ, ট্যালেন্ট...।

খুবই। স্যরি বাবা, এখানে তোমার সঙ্গে ওর কোনো মিল নাই।

আরে না না, আমার মাথায় তো ঘিলু বইলাই কিছু নাই।

শেষে যেটা ঠিক হলো, কিছুদিনের মধ্যেই কায়সার ও তার মা দুজনকেই দাওয়াত দেওয়া হবে। আতিকুজ্জামান ও তার স্ত্রী দুজনেই যাবে দাওয়াত করতে। রাতে তারা একসঙ্গে খাবে, গল্প করবে।

আতিকুজ্জামান জিজ্ঞেস করল—খুশি?

নাজিয়া উঠে গেলে আতিকুজ্জামান ফিরল স্ত্রীর দিকে—এই পোলা সম্পর্কে কিছুই জানি না।

তুমিই না বললে ছেলে দেখতে সুন্দর, ট্যালেন্ট।

আরে, সেইটা বললাম আরকি! তুমি তো অনেকটা সময় ধইরা দেখছ। তোমার কী মনে হইছে?

ছেলে ভালো।

ভালো?

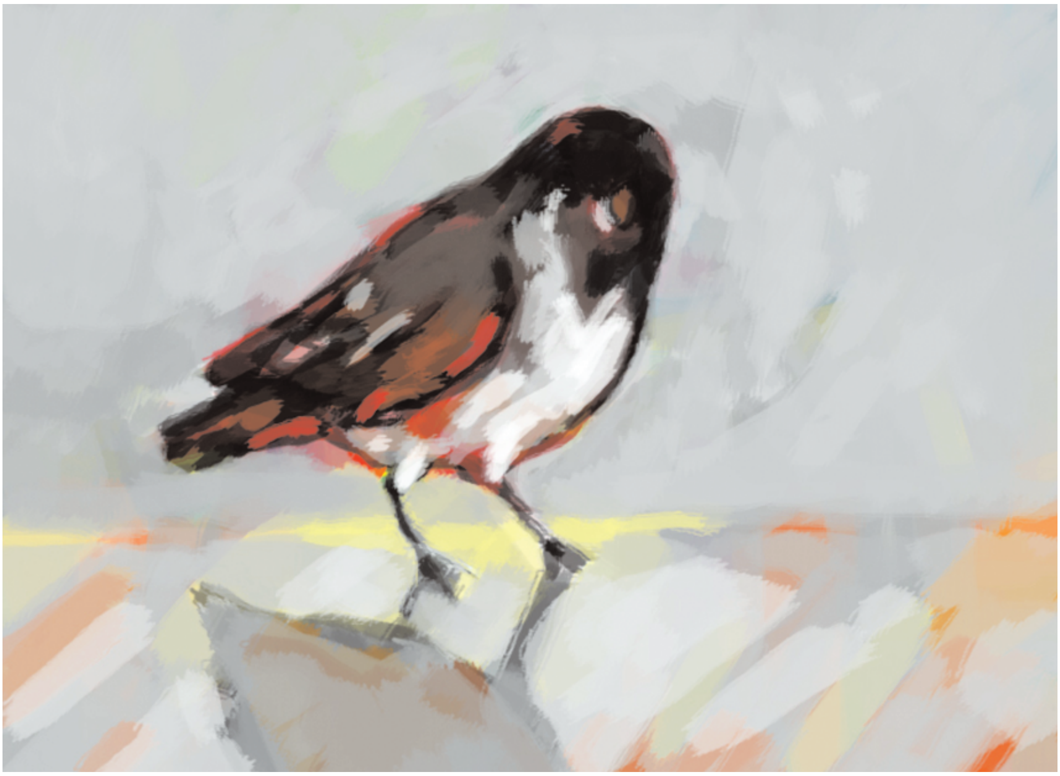

হু, ভালো। অবশ্য তুমি হাইফাই ফ্যামিলি চাইলে অন্য কথা। এই ছেলে হাইফাই ফ্যামিলির ছেলে না।

আমি হাইফাই চাই? আমি আজ যাইতেছি মালয়েশিয়া, কাল যাইতেছি হংকং, তুমি বাড়ি সাজাইতে গিয়া আমারে ফকির বানায়া ফেলছ, আর আমারে কইতেছ আমি হাইফাই চাই!

তাও কি না, এইটা তো জানি না।

চাই না। একটা ভালো, ভদ্র, বুদ্ধিমান পোলা চাই, যে নাজিয়ারে খুব ভালোবাসব। বুঝছ?

আপাতত এ রকমই ঠিক হয়ে গেছে, আতিকুজ্জামান আর তার স্ত্রী দাওয়াত দিতে যাবে। কিছুটা সময় একসঙ্গে কাটালে যা যা বোঝা দরকার, তার অনেক কিছুই বুঝে নেওয়া যাবে।

জুসের গ্লাস খালি করে আতিকুজ্জামান উঠে দাঁড়াল। এখন একটা গোসল, নাশতা, তারপর কাজে বের হওয়া। সে বাথরুমে ঢোকার আগে-আগে দড়ির ফোন এল—ভাই।

খবর কী! এত সকালবেলা ফোন দিছ।

আইনুদ্দীন ট্যাকা ফেরত দিছে।

আতিকুজ্জামানের মনে হলো সে হঠাৎই একটু বোকা হয়ে গেছে, একটু সময় নিল সে—পাইছ?

ভাই, পাইছি।

দড়ি, তোমারে কী বলব! আজ ঘুম ভাঙার পর থেইকা মন খুশি খুশি।

ভাই, ট্যাকাগুলা বাসায় নিয়া আসব না ব্যাংকে জমা দিব?

ব্যাংকে না। বাসায় আনো। ব্যবস্থা আছে?

জি, গাড়ি আছে!

আর কেউ জানে? আইনুদ্দীন ফাঁদ পাতে নাই তো?

না।

তুমি এত ঠিকঠাক বলো ক্যামনে! আমি নিজেও এত নিশ্চিত বলতে পারি না।

দড়ি চুপ করে থাকল।

রওনা দাও। আমি তুমি না আসা পর্যন্ত বাইর হব না।

জি, রওনা দেই।

আর শুনো, তোমারে একটা ধাঁধা দেই...।

ধাঁধা!

ধাঁধা। একজন লোক বলল, সে সব সময় মিথ্যা কথা বলে। এখন তোমারে বলতে হবে এই লোকটা সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী।

ভাই, আমি কিছু বুঝতেছি না।

আসতে আসতে ভাব। উত্তরটা বাইর করো। বাসায় আইসা তারপর আমারে জানাও। বুঝছ, সে বলল, সে সব সময় মিথ্যা কথা বলে। এখন বলো, সে সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী।

নাদিরা বেগমকে ইতস্তত করতে দেখা গেল। সে একবার ঘরের দরজার দিকে তাকাল, একবার দেয়ালের দিকে, পরে কায়সারের দিকে। কায়সার বলল—আম্মা, তোমার অসুবিধা কী?

কোনো অসুবিধা নাই বাপ।

কিন্তু তোমার চেহারা সেইটা বলে না।

এইটা কিছু না বাপ। একটু চিন্তা লাগে।

চিন্তা!

ধরো, চিন্তা না, অস্বস্তি।

তুমি তো আসলে লোকজনের সঙ্গে বেশি মেশো না।

আচ্ছা, একটা কথা বলো তো আমারে। তোমরা কি বিবাহ কবে করবা, এটা ঠিক করেছ?

কায়সার একটু দোটানায় পড়ল। সে প্রথমে বোঝার চেষ্টা করল, কী বললে সেটা স্বাভাবিক শোনাবে। তারপর তার মনে হলো, যা সে আর নাজিয়া ঠিক করেছে, সেটাই বলা উচিত, অন্য কিছু বলতে গেলে সেটা নাদিরা বেগমের কাছে মিথ্যা-মিথ্যাই শোনাবে।

কায়সার বলল—আমাদের ইচ্ছা পরীক্ষার পর পরই। এখন তোমরা যা বলবে।

নাদিরা বেগম হাসলেন—ঠিকই তো করে ফেলছ। আমরা কী বলব!

আম্মা, আমরা তো ঠিক করবই। এখন তোমরা মুরুব্বিরা সেটা নিয়ে আলোচনা করবে।

বিবাহের আগে একটা চাকরি দরকার।
তুমি জানো আমার চাকরি ঠিক। ওরা এই সেদিনও বলেছে।
আমার ইচ্ছা ছিল তুমি বিদেশ যাবা। পিএইচডি...।
যাব আম্মা। যাব তো বটেই। তবে তার আগে এক বছর এখানেই থাকতে চাই। ধরো, পিএইচডি করতে গেলে তো মিনিমাম তিন বছর লাগবেই।
বিবাহ করবা, পিএইচডি করতে যাবা, বউ একলা থাকবে?
সেও যাবে। সেও পিএইচডি করবে। সেও ছাত্রী ভালো।
আমার ঘরে তাইলে দুই-দুইটা পিএইচডি!
এখন বলো না, নাজিয়ার বাবা-মা কবে আসবেন দাওয়াত দিতে?
তুমি বলছিলা ওনারা খুব ধনী লোক।
জি। বোঝা যায়।
আমাদের এই ভাঙাচুরা বাসায় আসবেন, এইটা নিয়া ভাবি।
এটা নিয়া ভাবার কিছু নেই আম্মা।
কেন নাই বাপ?
আমরা যেই রকম আমরা সেই রকম।...আর নাজিয়া জানেই। আমাদের বাসায় ও এসেছে।
ওর বাবা-মা এইটা জানে না।
জানবে।
জানার পর ধরো দেখলা, তাদের মনে ধরে নাই। একটা কথা জিজ্ঞেস করি বাপ। ঠিক ঠিক উত্তর দিবা। ধরো, দেখলা, তাদের আপত্তি। তাদের ইচ্ছা নাই। তখন তুমি কী করবা?
তাদের অপছন্দ হলে সেটা জানাই যাবে। আমি নাজিয়ার সঙ্গে কথা বলব।
তোমার কী ধারণা, তার বাবা-মার পছন্দ না হলে নাজিয়া কী করবে?
একটু হাসল কায়সার, একটু মাথা চুলকাল—আম্মা, নাজিয়া আমাকে ছাড়া থাকতে পারবে না।
তুমি নাজিয়াকে ছাড়া থাকতে পারবা? ধরো, তার বাবা-মাকে আমার মনে ধরল না, আমার আপত্তি থাকল, তখন?
তুমি আপত্তি কেন করবে আম্মা! তুমি নাজিয়াকে দেখেছ।
আমি তার বাবা-মার কথা বলতেছি।
আম্মা।...আম্মা, সংসার করব আমি আর নাজিয়া, আমাদের পছন্দই বড়।
তোমার আম্মার পছন্দের কোনো মূল্য নাই?
আম্মা, তোমার ছেলের পছন্দের কোনো মূল্য নাই?

নাদিরা বেগম অপলক তাকালেন কায়সারের দিকে। সে ওভাবেই তাকিয়ে থাকলে কায়সারের অস্বস্তি শুরু হলো। সে আমতা আমতা করে বলল—আম্মা, আমি তোমাকে কত ভালোবাসি...।
নাদিরা বেগম খাট থেকে নামল—কথা ঘুরাবা না বাপ, কথা ঘুরাবা না। যা বলছ, সেইখানে থাকো। বলতে বলতে সে কায়সারের কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে কায়সারের কপালে চুমু খেল—ভালোবাসলে, যেই মানুষটারে ভালোবাসো, তার পক্ষে আর তোমাদের ভালোবাসার পক্ষে বাপ, এইভাবেই দাঁড়াবা।

সার্কাস শহীদের মন খারাপ। আইনুদ্দীন দড়ি বাবুলকে আতিকুজ্জামানের টাকা বুঝিয়ে দিয়েছে। কী বিচ্ছিরি, আইনুদ্দীন এটা একটা কাজ করেছে! এই এতগুলো টাকার লোভ সে সামলালো কী করে! কেন সে টাকাগুলো মেরে দিল না! বোকা গাধা, রামছাগল কোথাকার। আরে, তুই কি এসে সার্কাসের সঙ্গে একটু কথাও বলতে পারতি না? সার্কাস কি তোকে পরামর্শ দিত?
সার্কাসের সত্যিই মন খারাপ। আইনুদ্দীন আসতে পারত তার কাছে। কিংবা যদি যেতে বলত তাকে, সে যেত। আইনুদ্দীন হয়তো বলত—সমস্যা, কী করি!
সে বলত—সমস্যা তো দেখি না।
এতগুলা ট্যাকা কী কইরা দেই...।
কী করছেন ট্যাকা?
খরচ করছি।
ঠিক করছেন, ট্যাকা তো খরচ করনের জন্যই।
এখন যখন ধরেন ফেরতের কথা উঠছে...।
তখন ফেরত দিবেন না।
আইনুদ্দীন হয়তো হাসত—ফেরত দিমু না?
ফেরত দিবেন না। পাগল নাকি! ট্যাকা ফেরত দিবেন ক্যান!
আতিকুজ্জামানরে চিনেন না?
তার লগেই তো আছি।
আর দড়ি? দড়ি বাবুল যখন আইব?
তার দায়িত্ব আমার।
ভাই, দড়িরে চিনলে আপনে এই কথা বলতেন না।
সার্কাস জানে দড়ি সম্পর্কে যখন কেউ বলবে, তখন এই কথাই বলবে। দড়ি সম্পর্কে অনেক কথাই বাজারে ছড়িয়ে আছে। থাকুক, সে জানে, সে যদি নামে, সে দড়িকে সামলাতে পারবে, দড়ি হতে পারে দড়ি, কিন্তু সেও তো সার্কাস, খেলা সে কি কিছু কম জানে? সুতরাং আইনুদ্দীন যদি আসতই তার কাছে, সে বলতেই পারত—দড়ির দায়িত্ব আমার এবং দায়িত্ব সে সত্যিই নিত। বড় ভুল করে ফেলেছে আইনুদ্দীন টাকা ফেরত দিয়ে। ফেরত না দিলে দড়ির ওপর খেপত আতিকুজ্জামান, দড়িকে হুকুম দিত টাকা উদ্ধারের, সেই সময় সে কিছু খেলা খেলতে পারত, এই সুযোগটা তাকে দিল না ছাগল আইনুদ্দীন। ভেড়ার মতো ভীরু হয়ে সে ছাগলের মতো ছাগলামো করল। বড়ই হতাশ বোধ হচ্ছে সার্কাসের। একটা সুযোগ আসতে কত দিন লাগে?

ডাক্তারের কাছে কি যাওয়া দরকার?
এই প্রশ্ন নিজের ভেতরে তৈরি হতেই নিজেকে কষে একটা গাল দিল দড়ি—শালা, হোগার পুত, তরে দড়ি দিয়া বাইন্ধা ঝুলায়া রাখা উচিত।
তা, দড়ি না হয় নিজেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখল, তাতে কি এই সমস্যাটা মিটবে—ইদানীং মাঝে মাঝেই কেন সে শরীরে জোর পায় না?
সে বিছানা ছেড়ে নামার চেষ্টা করল। পারল না।
এইটা কী ব্যাপার? এইটা তো মনে হয় জাদুটোনা করছে কেউ।...বসন্ত...বসন্ত!
বসন্তকুমার আসতে সময় নিল।
সমস্যা কী? ভ্রমণে বাইর হইছিলা?
ওষুধ আনতে গেছিলাম।
তোমার আবার কী হইল?
আমার না, আপনের ওষুধ।
ওস্তাদি মারলা? বসন্তকুমার, আমি ওস্তাদি পছন্দ করি না।
কথা কম কন। উঠেন, দুইটা ট্যাবলেট একসঙ্গে খাইবেন।...খাইছেন কিছু?
তুমি দুর হও। দড়ি কুনোদিন ওষুধ খায় নাই।
বিবাহের দিন কেউ যদি বলে, বিবাহ করব না, আমি কুনোদিন বিবাহ করি নাই...।
তুমি তো দেখি বোকা না।...দাও, ওষুধ দাও।
একটা ঘুম দিবেন।
তুমি মাঙ্কিরে পাঠাও।
ঘুম দ্যান। আপনার শইল খুব খারাপ।
সেইটা আমিও বুঝতেছি।
ডাক্তার খবর দিব?
মাঙ্কিরে আনো। সে ডাক্তার হিসেবে বড়।
বসন্তকুমার হতাশ চোখে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, বিড়বিড় করে কিছু বলল, বোঝা গেল না। সে চলে গেল এবং একটু পর মাঙ্কিকে নিয়ে ফিরে এল—এই লন আপনার বান্দর।
আবার বান্দর বললা! আবার! বসন্ত, তোমার সাহস দেইখা আমি অবাক যাই।
বসন্তকুমার দড়ির কথা যেন শুনলই না। সে চলে গেলে দড়ি তাকাল মাঙ্কির দিকে—তুমি ওর কথায় কিছু মনে কইরো না। সে তোমারে পছন্দ করে না, আবার তার মাথায়ও কিছু গোলমাল আছে।
মাঙ্কি দাঁত মেলে দিল।
তোমারে ডাকছি ক্যান জানো? তোমারে একটা ধাঁধা জিজ্ঞাসা করব। এইটা মাঙ্কি টাইপ ধাঁধা। উত্তর তুমি জানলেও জানতে পারো। শুনো—একটা লোক বলল, সে সব সময় মিথ্যা কথা বলে। এখন তোমার বলতে হবে, এই লোক সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী?...পারবা, মাঙ্কি? এক কাজ করো। তুমি বইসা বইসা ভাব, আমি একটু ঘুমাই।

দুই.

নাদিরা বেগমের বাড়ির সামনে গাড়ি থামল। আতিকুজ্জামান তার স্ত্রী ও কন্যার দিকে তাকাল–তোমরা এখনই গাড়ি থেইকা নামবা না। আমি বললে তারপর নামবা।

আতিকুজ্জামান গাড়ি থেকে নামল। সামনের দোতলা বাড়িটা বহিরঙ্গে যদিও অনেক বদলে গেছে, আতিকুজ্জামানের চিনতে ভুল হওয়ার কথা না। সে বাড়ির দিকে চোখ না ফিরিয়ে তাকিয়ে থাকল। বাড়ির বারান্দায় কায়সার দাঁড়িয়ে। তাকে দেখে সালাম দিয়েছে। সালামের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি আতিকুজ্জামান, কায়সারের দিকে ফিরে তাকানোরও না, সে তাকিয়ে থাকল বাড়িটার দিকে। তার মুখে হাসি, তার এতটাই অবাক লাগছে, এতটাই নিজেকে পায়ের নিচে মাটিহীন মনে হচ্ছে, ওই হাসিটুকু মুখে ঝুলিয়ে রাখতে না পারলে সে আর কোনো ভর পেত না, দাঁড়িয়ে থাকাই তার জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াত।

বারান্দায় নাদিরা বেগমকে দেখা গেল। নাজিয়া গাড়ির জানালা দিয়ে গলা বের করে বলল–আব্বা, কায়সারের আম্মা, কায়সারের আম্মা। বলে সে গাড়ি থেকে নামতে নিল।

নামবা না। আমি নামতে বারণ করেছি।

কিন্তু আব্বা, কায়সারের আম্মা...।

নাদিরা বেগম?

আব্বা, ওনার নাম নাদিরা বেগম।

নাজিয়ার মুখ থেকে জানার তার দরকার ছিল না। তার জিজ্ঞেস করারও দরকার ছিল না ওই মহিলা নাদিরা বেগম কি না, নাদিরা বেগমকে সে চিনতে পারবে না! আতিকুজ্জামান টের পেল নাদিরা বেগম তার দিকে তাকিয়ে আছে। আতিকুজ্জামানও তাকাল। তারা দুজন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল। একসময় অস্বস্তি লাগতে আরম্ভ করল আতিকুজ্জামানের। তার মনে হলো, নাদিরা বেগমের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারছে না সে, তাকিয়ে থাকার মতো অতটা শক্তি তার নেই। নাদিরা বেগম অবশ্য, এত দূর থেকেও বুঝল আতিকুজ্জামান, নিষ্পলক। নাদিরা বেগম নিষ্পলকই থাকবে, তার সেই ক্ষমতা আছে, আতিকুজ্জামান জানে।

চোখ সরিয়ে নিল আতিকুজ্জামান। কখনো এত ক্লান্ত, এত হতাশ বোধ করেনি। এত অসহায়ও নিজেকে তার কখনো লাগেনি। একবার ট্যারা লোকমান তার বুকে পিস্তল ঠেকিয়েছিল, আর তার সঙ্গে কেউ ছিল না, সেবারও না। আরেকবার, সেই কবে, পুলিশ গুলি ছুড়েছিল তাকে ঘিরে ফিরে, সেবারও না, আরেকবার তার দলটা ভেঙে গিয়েছিল পুরো, শুধু দড়ি ছিল তার সঙ্গে, তারা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, তাদের থাকারও জায়গা ছিল না, সেবারও না।

আতিকুজ্জামান আরেকবার ওপরে তাকাল। নাদিরা বেগম তখনো তাকিয়ে আছে। তার মুখে কি সামান্য হাসি? আতিকুজ্জামান ঠিক বুঝতে পারল না। তার মনে হলো, হাসি হতেও পারে। হাসি ছাড়া কী-ইবা করার আছে, তার কিংবা নাদিরার?

বড় করে শ্বাস ফেলে আতিকুজ্জামান গাড়িতে উঠে বসল।

কামরুল যখন ঝামেলা বহন করতে রাজি হয়নি, তখন কি এতটা অসহায় বোধ করেছিল সে? নাদিরা এত দিন পর সে সময়ের কথা মনে করতে পারল না, তার মনে হলো তখন অবস্থা এতটা অসহায় ছিল না। কামরুল যখন বিয়ে করতেও রাজি হয়নি, তখনো জোর হারায়নি সে।

তারপর এত বছর ধরে কম ঝক্কি তাকে পোহাতে হয়নি। এ ঝামেলা করে ও ঝামেলা করে, এ বিপদে ফেলতে চায়, ও বিপদে ফেলতে চায়, এ এই প্রস্তাব নিয়ে আসে তো ও ওই প্রস্তাব নিয়ে আসে–এসব সামাল দেওয়া সহজ ব্যাপার ছিল না। কখনো কখনো তার মনে হয়েছে, এই এখনই সে ভেঙে পড়বে। এ রকম ভেঙে পড়ার কথা মনে হয়েছে তার, এ রকম অসহায় নিজেকে কখনো মনে হয়নি। নাদিরা বেগম বুঝতে পারছে না, পাপ কি খুবই বড় ছিল তার যে এমন এক পরিস্থিতিতে পড়তে হবে!

খাটের এক কোনায় বসে আছে সে। বসে থেকে সে স্বস্তি বোধ করছে না। সে জানে দাঁড়িয়ে সে স্বস্তি বোধ করবে না, কোনো কিছুতেই স্বস্তি আসবে না তার। তবু তার বসে থাকতে ইচ্ছা করছে না। তার উঠে দাঁড়াতে ইচ্ছা করছে। ওঠার চেষ্টাও করল সে, পারল না, ভয়ও পেল, তার মনে হলো, তার পায়ের নিচে অসীম শূন্যতা।

এই যে সেই তখন থেকে তার ছেলে তার সামনে বসে আছে, তাকে সে কী বলবে! তাকে কি বলবে এত বছর পর দেখেও যেমন প্রচণ্ড ঘৃণা হয়েছিল তার, ঘৃণা তো তার থেকেই গেছে, আবার সেই ঘৃণার পাশাপাশি তার কি অন্য রকম কোনো অনুভূতিও হচ্ছিল? কিন্তু এ কথা ছেলে জানতে চায় না, এ কথা ছেলের মাথায় নেই, এ কথা ছেলের মাথায় থাকার কথাও না। ছেলের মাথায় একটাই প্রশ্ন, বিস্ময় ও ক্ষোভ মেশানো–আম্মা, ওনারা চলে গেলেন কেন!

বাপ, সেইটার আমি কী বলব?

আম্মা, তুমি সেইটা জানো।

আমি কী করে জানব বাপ?

তোমার মুখ দেখে আমি বুঝি।

আমি জানি না।

তুমি জানো।...কিছু একটা ব্যাপার আছে।

নাদিরা বেগম প্রচণ্ড চমকে উঠেছিল। 'কিছু একটা ব্যাপার আছে'–এই ধারণা ছেলের মাথায় আসা স্বাভাবিক, কিন্তু এই ধারণা ছেলেকে কতদূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে! শীত শীত লাগল নাদিরা বেগমের, তার ভয় ভয় লাগল। ছেলের মুখের দিকে তাকানোর সাহসও তার হচ্ছে না। কিছু একটা বলা দরকার, বুঝতে পারছে সে, কী বললে যুক্তিসংগত হবে, এটা সে কিছুতেই গুছিয়ে উঠতে পারছে না।

কায়সার একসময় উঠে দাঁড়াল–আম্মা, তুমি বলবে না?

কী বলব বাপ?

আমি কী জানতে চাচ্ছি সেটা তুমি জানো।

আমি যদি বলি তুমি কি সেটা সহ্য করতে পারবা!

তুমি বলো।

বলি। কিন্তু শর্ত আছে একটা। যদি কথা দাও শর্ত রাখবা, তাইলে বলি।

নাজিয়ার প্রতিক্রিয়া দেখার অবস্থায় ছিল না আতিকুজ্জামান। তবু ফেরার পথে বারকয়েক যতবার চোখ গেল নাজিয়ার দিকে, সে নাজিয়াকে দেখল নিশ্চুপ। বরং তার স্ত্রী বারবার তাকে বিরক্ত করছিল–সমস্যা কী...তুমি এ রকম করলে কেন...কিছুই তো বুঝলাম না।

শেষে সে এমন কঠিন চোখে তাকাল, তার স্ত্রী চুপ করে গেল। আতিকুজ্জামান মাহমুদকে একটা মেসেজ পাঠিয়ে রাখল মোবাইল ফোনে, যত ব্যস্ততাই থাকুক, মাহমুদ যেন আজই তার সঙ্গে দেখা করে। মেসেজটা পাঠিয়ে বাকি পথটুকু সেও মূর্তির মতো বসে থাকল।

বাসায় পৌঁছেও একটা কথা বলল না নাজিয়া। প্রথমে সেই নামল গাড়ি থেকে। দ্রুতই সে এগোল। আতিকুজ্জামান বুঝতে পারল নাজিয়া এখন ঘরে ঢুকে দরোজা বন্ধ করবে।

নাজিয়া করলও তা-ই। দরোজা বন্ধ করার শব্দ দূর থেকেও পাওয়া গেল। সেই শব্দ আতিকুজ্জামানকে আরো একটু নড়বড়ে করে দিল। যদি এমন হতো, রাগ করেছে নাজিয়া, নাজিয়া তার ওপর এমন রাগ করেছে যা সে আগে কখনো করেনি, তবেও একটা কথা ছিল, একসময় এই রাগ পড়ত, সে চেষ্টা করতে পারত নাজিয়ার রাগ কমানোর, হয়তো সময় লাগত, কিন্তু সেটা সম্ভব ছিল। এখন কোনটা সম্ভব, তার কিছুই আতিকুজ্জামান বুঝতে পারছে না, সব কিছুই তার কাছে অসম্ভব মনে হচ্ছে।

স্ত্রী তার দিকে তাকিয়ে আরেকবার চেষ্টা চালাল–বলবে?

তোমারে একবার বললাম না চুপ থাকতে।

তখন তো নাজিয়া ছিল। আমি ভাবলাম তুমি নাজিয়ার সামনে বলতে চাও না।

আমি তোমাকেও বলতে চাই না।

ব্যাপার কী?

যাও।

তুমি ওই মহিলাকে চেন?

আর একটা কথা বলবা তো গলা চিপ্পা ধরব।

স্ত্রী তার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে চলে গেল।

আতিকুজ্জামান মাহমুদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। মাহমুদ এল বেশ অনেকটা পরে–কী ব্যাপার ভাই, জরুরি তলব।

এইটা তোমার আসার সময় হইল!

চাকরি করি।

ট্যাকা তো আমিও তোমারে দেই।

ভাই, সমস্যা বলেন।

সমস্যা বলল আতিকুজ্জামান, সে বলল—এই দুনিয়ায় মাত্র দুইজন লোক জানে এই ঘটনা।
আমি পুরা জানি না।
আর কী জানার দরকার মনে করতেছ?
আমি জানি আপনার ঘটনা ছিল, মানে প্রেম আর কি, তারপর ধরেন আরো কিছু জানি, কিন্তু উনি কে, কই থাকেন—এসব কিছুই আমি জানি না।
তোমার জানার দরকার নাই। নাকি আছে বলে মনে করো?
উনি লালবাগ থাকেন, না?
আতিকুজ্জামান অবাক হয়ে গেল—তোমারে কে বলছে?
ওনার নাম নাদিরা বেগম। যে ছেলের নাম বলতেছেন, তার নাম কায়সার?
আতিকুজ্জামান চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল না, তার মুখের কোনো রেখাও বদলাল না, সে শুধু শীতল গলায় জিজ্ঞেস করল—তুমি এই সব কী কইরা জানো মাহমুদ?
নাজিয়ারে একদিন দেখলাম ওই ছেলের লগে, খটকা লাগল—নাজিয়া এইখানে ক্যান। ভাবলাম—আইছে বন্ধুর বাড়ি। তবু খটকা গেল না। তাই খবর নিলাম। জানলাম। এখন দুইয়ে দুইয়ে চার যোগ কইরা আপনেরে বলতেছি।
আমারে আগে জানাও নাই ক্যান?
কী জানাব? আমি কি জানি অতসব? দড়ি জানে।
শুধু তুমি আর দড়ি জানো।
দড়ি বেশি জানে, আমি কম জানি।
সবার জানার হিসাব আছে, যার এইটুকু জানা দরকার সে যদি বেশি জানে...।
এইটা ভুল কথা বললেন। আমি যদি পুরা জানতাম, নাজিয়ার খবর আগে দিতে পারতাম, আপনেরে লালবাগ পর্যন্ত যাইতে হইত না।
কথা বেশি বলতেছ মাহমুদ। কথা কম বলো। মেজাজ শজারুর কাঁটা হইয়া আছে।
থাকারই কথা। সুন্দর বলছেন। এখন আমি কী করব, সেইটা বলেন।
গল্প তৈয়ার করো।
কারে বলবেন?
তুম কি মজা নিতেছ মাহমুদ?
আপনে নিজে একটু ভাবেন—ঘটনা তো মজার। আপনার নিজের না হইলে আপনেও মজা পাইতেন। এইটা দিয়া ধারাবাহিক ফিচার হয় পত্রিকায়। পাবলিক লাফায়া পড়ব।
কিছু না বলে আতিকুজ্জামান মাহমুদের দিকে তাকিয়ে থাকল।
আমি অবশ্য বলি নাই যে আমি ফিচার লিখব। বলেন, নাজিয়ারে বলার জন্য গল্প দরকার?
হ্যাঁ। এমন একটা গল্প দরকার যেইটা নাজিয়া বিশ্বাস যাবে।
সময় বরাদ্দ করলেন কতক্ষণ?
এই এখনই তৈরি করবা। আমার সামনে বইসা।
ভাই, আমি তো হুমায়ূন আহমেদ না। আমি...।
হুমায়ূন আহমেদ কে? ওই যে নাটক লেখে?
জি। আমি উনি না। আমি গরিব সাংবাদিক। গাড়িবাড়ি নাই, মোটরসাইকেলে আসা-যাওয়া করি...।
ধরো, গাড়ি হইছে তোমার। কিন্তু গল্প এমন বানাইবা, আমি যে ওই বাড়িতে না ঢুইকা ফেরত আসলাম—কেন আসলাম—এইটা য্যান নাজিয়া বিশ্বাস করে। বুঝলা?
জি।
ভুল আমারই। গাড়ি যখন ওই এলাকায় ঢুকছে, তখনই বোঝা উচিত ছিল। কিংবা আরো আগে এইটা বোঝা দরকার ছিল। কায়সাররে যখন প্রথম দেখলাম, তখন, চেহারা তো তার আমার মতোই হইছে।
দড়ি যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। তাকে ক্লান্ত ও অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। এগোতে গিয়ে সে থামল, পেছন ফিরে তাকাল নাদিরা বেগমের দিকে, তাকে দেখে বোঝা গেল সে দ্বিধায় আছে।
কিছু বলবা?
জি।...আম্মা, ভাল্ লাগতেছে না।
ভালো তো আমারও লাগতেছে না।
জীবনে অনেক সমস্যা দেখছি, এই রকম দেখি নাই।
সময় নাই দড়ি। তুমি রওনা দাও।
জি দিতেছি।
দাঁড়াও।...আমি বুঝতেছি তোমার শরীর খুবই খারাপ, কিন্তু আমার যে উপায় নাই, এইটা কি তুমি বুঝতেছ?
দড়ি একটু হাসার চেষ্টা করল—আম্মা, আমি যাই। সময় কম।
সময় কম। এর মধ্যে কামরুল যদি নাজিয়ারে অন্য গল্প বইলা বসে, ঝামেলা। তখন কায়সার জানব এক গল্প, নাজিয়া জানব অন্য গল্প।
রাস্তায় নেমে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল দড়ি। কিছু দূরে একটা গাড়ি বাতি নিভিয়ে অন্ধকারে অন্ধকারের অংশবিশেষ হয়ে আছে। দড়ি একা আসেনি। একা আসার মতো জোর তার শরীরে নেই। মনেও না, শরীর কমজোরি হলে মনও হয়, এটা কদিন হলো সে টের পাচ্ছে। ওদিকে সার্কাস শহীদ যে অপেক্ষায় আছে, এ খবরও আছে তার কাছে।
রাস্তাটা নির্জন। রাত হয়েছে। শরীরে জোর নেই, তবু হো হো করে হাসতে ইচ্ছা করল দড়ির। কেন তার হাসার ইচ্ছা হলো সেটা সে বুঝতে পারল না। ঘটনা ভয়াবহ, এটা তো সে বুঝতেই পারছে। এত দিন যে সত্যটার দরকার ছিল না, সেটা হঠাৎ নিজেকে জানান দেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে। জানাজানি হয়ে গেলে কী হবে, সেটা দড়ি যত না ভাবছে, তার চেয়ে বেশি ভাবনা তার 'আম্মা'কে নিয়ে। আম্মা বিপদে, আম্মাকে সে অসহায় দেখেছে, চোখের কোণে পানি দেখেছে—এর বেশি আর কিছুর কি দরকার আছে?
তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গাড়ি থেকে নেমে এল একজন—বস...।
কিছু হয় নাই!
দাঁড়ায়া আছেন...।
সমস্যা জটিল।
চলেন।
ঘটনা শোনো, তুমি একটা মিথ্যার ওপরে আছ, থাকতে থাকতে সেই মিথ্যা কিন্তু সত্য। এই রকম যদি থাকে, সমস্যা নাই...।
বস চলেন, আপনার পাও কাঁপতেছে।
সমস্যা হইল তখন, যখন সেই মিথ্যা বলে আমি তো মিথ্যা না, আমি হইলাম সত্য।
জি।
তুমি কিছুই বোঝো নাই। তুমার বুঝনের কথাও না। সামনে যে সমস্যা সেইটাও বড়।...চলো।...সামনে আছে দুই গল্প মিল-অমিলের সমস্যা। দুইজনে দুই জায়গায় দুই গল্প বলছে, দুইজনের দুই গল্প এখন এক গল্প হইতে হইব।...কও, ঝামেলা না?
শেষ রাতের দিকে দড়ির ফোন পেল নাদিরা বেগম। দড়ি বলল—আম্মা, শইল সুবিধার না, আসতে বললে আসব, আর যদি ফোনে বলার অনুমতি দেন তাইলে ফোনে বলব।
ফোনে বলো। তোমার আসার দরকার নাই।
আম্মা, আপনার গল্প ভাই নেয় নাই।
নেয় নাই! বলে নাদিরা বেগম চুপ করে গেল।
দড়িও চুপ করে থাকল কিছুটা সময়—জি, নেয় নাই।
ক্যান! নেয় নাই ক্যান! কামরুলের কী অসুবিধা!
তিনি বললেন এই মিথ্যা তিনি ক্যান নিবেন!
কামরুল তার গল্প নেয়নি, এইটা শোনার পর থেকেই নাদিরা বেগমের হতাশা বেড়ে গিয়েছিল, তবু সে দড়ির কথা শুনে ফেলল—কামরুল বলল এই মিথ্যা সে ক্যান নিবে?
জি।
মিথ্যা তো পুরাটাই। একটা বড় মিথ্যার লগে আরেকটা মিথ্যা যোগ হইলে কী সমস্যা?
আম্মা, এইটা তো আমি বলতে পারব না।
এই মিথ্যা যখন সে নিব না, তখন তারে পুরা সত্য নিতে বলো।
দড়ি চুপ করে থাকল।
নিবে সে?
বেয়াদবি না নিলে একটা কথা বলব আম্মা?
বলো।
পুরা অবস্থা আপনেও নিতে পারবেন না আম্মা।
নাদিরা বেগম হাসলেন—তুমি এইভাবে আমার লগে কুনোদিন কথা বলো নাই।
আম্মা, মাফ করবেন।

দড়ি, তুমি ঠিক কথা বলছ। মাফ চাওনের কিছু হয় নাই।...আচ্ছা, কামরুলে যে গল্প নিল না, সে তার কন্যা সামাল দিব ক্যামনে?

নাজিয়া আপারে উনি সম্ভবত অন্য গল্প দিছেন।

নাজিয়া বুদ্ধিমান মেয়ে। কামরুলের গল্প সে বিশ্বাস যাইব?

গল্প ভাই বানায় নাই। আমার ধারণা গল্প বানাইছে মাহমুদ। সে সাম্বাদিক।

সাংবাদিক!–মাহমুদ...!

আছে। এগো ১০০ টাকা দিলে খুশি। আমি একবার এক সাম্বাদিকের কাছে দুইটা পিস্তল জমা রাখছিলাম।

এইটা সমস্যা না দড়ি, এইটা সমস্যা না।

আম্মা, বুঝতেছি। কিন্তু কী করব, এইটা বুঝতেছি না।

যেই গল্প একরকম হওয়া উচিত সেই গল্প দুই রকম হইল। দড়ি, এই সার্কাস শুরু হইব, আমি কি ভাবছিলাম!

কী করবে? নাজিয়া জানতে চাইল।

তুমি কী করবে? কায়সার জিজ্ঞেস করল।

যাই করি, তুমি কি আমার সঙ্গে থাকবে?

তুমি জানো সেটা।...তুমি থাকবে?

তুমিও সেটা জানো।

কিন্তু নাজিয়া, বারবার যেটা বলছি, আমার মা আমাকে মিথ্যা বলেছেন, এটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না।

আমার একটা ব্যাপার কী হচ্ছে জানো? এই যে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি, কথা বলছি...ভাবছি, আমার মনে হচ্ছে, এমনকি হতে পারে, তোমার বাবা মিথ্যা বলেননি।

আমার মা যেটা বলেছেন, সেটা ঠিক?

ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো তুমি। আমার বাবাও মাস্তান ছিলেন। আমার বাবার হাতেই কি তোমার বাবা খুন হতে পারেন না?

পারেন।

তাহলে?

বুঝতে পারছি না।...শুধু মনে হচ্ছে, কোথাও একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে।

তোমার মা যেটা বলেছেন, সেটা খুবই বিশ্বাসযোগ্য।

তোমার বাবা যেটা বলেছেন, সেটাও বিশ্বাসযোগ্য।

কী বলছ তুমি, এমন একটা বাজে কথা!

কায়সার চুপ করে থাকল।

কী হলো, কথা বলছ না কেন?

বুঝতে পারছি না।

কিন্তু একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?

কী?

আমাদের বিয়েটা পারিবারিকভাবে সম্ভব না।

কী করা উচিত আমাদের?

ধরো, কী করা উচিত আমাদের সেটা আমরা জানি। কিন্তু সেটা কি এই এখনই করা উচিত, নাকি সময় নেব আমরা?

তোমার কি ধারণা, তোমার বাবা এরপর আমার সঙ্গে তোমাকে মিশতে দেবেন?

না। কিভাবে বন্ধ করবেন, তা আমি জানি না। কিন্তু চেষ্টা তো করবেনই।...কায়সার, এই একই কথা তো তোমার আম্মার সম্বন্ধেও। তোমার বাবাকে যে গুলি করে মেরেছে, তার মেয়ের সঙ্গে তুমি মিশবে, সেটা কি তিনি চাইবেন?

না। আম্মা কী বলবে জানি না, কিন্তু বলবে তো বটেই।

তাহলে? বলো ছুঁচো, তাহলে?

আমি কিছু জানি না কাকাতুয়া, আর কিছু না, শুধু জানি আমাদের প্রেম।

হ্যাঁ, এটা। এটা ভুলে যেয়ো না। আমাদের প্রেম।

তিন.

নাজিয়ার ঘর যেমন থাকে সাধারণত, ঠিক সে রকম। কিছু গোছানো, কিছু এলোমেলো। কম্পিউটার টেবিলের সামনে চেয়ারটা বাঁকা হয়ে আছে, বিছানার এক কোণে ল্যাপটপ, আলমিরার পাল্লা পুরো বন্ধ না, চেস্ট অব ড্রয়ারের ওপর একটা ফটোস্ট্যান্ড উল্টো হয়ে আছে, আবার পড়ার টেবিলটা টিপটপ গোছানো–কেউ দেখলে বুঝবে না এ ঘরে যে থাকে, সে এ ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে। আতিকুজ্জামান বুঝতে পেরেছে। কারণ আতিকুজ্জামানের এ রকম একটা ভয় ছিল।

কিছু ব্যবস্থাও নিয়েছিল সে, নাজিয়ার সঙ্গে যা সে কখনো করবে ভাবেনি, সে রকম কিছু। তার বাইরে যাওয়া সে বন্ধ করে দিয়েছিল, মোবাইল ফোন নিয়ে নিয়েছিল, একটা ল্যান্ডফোনের লাইন কেটে রেখেছিল, এ রকম আরো কিছু আর বাড়ির বাইরে সে কিছু লোক রেখেছিল। সার্কাস শহীদের লোক, তাদের ওপর মাত্র দুটো কাজের ভার ছিল–কায়সার এ বাড়ির দিকে আসতে নিলে তাকে থামিয়ে দেওয়া, নাজিয়া এ বাড়ি থেকে বের হয়ে কোথাও যেতে নিলে তাকে আটকানো। তারা কাজটা করতে পারেনি। বোকার দল। তবে এদের ব্যাপারটা সে পরে দেখবে। সে গলা তুলে স্ত্রীকে ডাকল। স্ত্রীকে বলল–মেয়ে পলাইছে। নাজিয়া পলাইছে। কাঁদবা না, হাসবা না, চিল্লাবা না। তোমারে একটা দায়িত্ব দিছিলাম, এইটা তুমি রাখতে পারো নাই। কী করবা এখন? টিকিট কাইটা দেব? মালয়েশিয়া ঘুইরা আসবা?...গর্দভের বাচ্চার মতো দাঁড়ায়া না থাইকা নাজিয়ার বন্ধুবান্ধব যাদের চিনো, ফোন দাও তাদের, দেখো কিছু বাইর করতে পারো কি না।

আতিকুজ্জামান এসে বারান্দায় বসল। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে, সে নিজেকে বলল, এখন মাথা হবে পাগলের তেলমাখা ঠাণ্ডা। তার মনে হচ্ছে সে পারবে, সে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারবে। সে প্রথমে ব্যাংকে ফোন করল। ম্যানেজার তার পরিচিত ও বিশ্বস্ত। আধা মিনিটে তাকে জানিয়ে দিল, গতকাল নাজিয়ার অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় সব টাকা তোলা হয়েছে। যে বেয়ারার চেকে টাকা তোলা হয়েছে, সে চেক কায়সারের একজনের নামে ইস্যু করা ছিল। এই ব্যাংকে অবশ্য খুব বেশি টাকা ছিল না। অন্যান্য ব্যাংকে যেসব অ্যাকাউন্ট, সেসব ব্যাংকে জিজ্ঞেস করলেই তথ্য পাওয়া যাবে না। এ জন্য সময় লাগবে। কত টাকা এখন নাজিয়ার হাতে, এটা আন্দাজ করা দরকার। এই আন্দাজের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। যত বেশি টাকা হাতে, তত বেশি খুঁজে বের করা কঠিন।

আতিকুজ্জামান ফোন করল মাহমুদকে, তাকে আসতে বলল। কিছুক্ষণ সে চুপ করে বসে থাকল। পালাল কি নাজিয়া, পালাল কী করে? চেক পৌঁছে দিল কী করে কায়সারের হাতে, কী করে?

শেষ ফোনটা সে করল সার্কাসকে–তুমি কি ছাগল দিছিলা আমারে?

ভাই, কী হইছে বলেন? আমি ছাগল পালি না।

পালো কি পালো না, সেইটা আমি বুঝতেছি। তোমার ছাগলগুলারে ফাঁকি দিয়া নাজিয়া উধাও হইছে।

এইটা অসম্ভব মনে হইতেছে। কিন্তু আপনে বলতেছেন...। আমি আসতেছি।

আসো। সে বাচ্চা মেয়ে। আমি তোমারে বলছিলাম সে বিপদের মধ্যে আছে।

দড়ির দিকে চিঠিটা এগিয়ে দিল নাদিরা বেগম।

আম্মা, আপনে পড়েন।

নাদিরা বেগম চিঠিটা সরিয়ে নিলেন–থাক, পড়ার দরকার নাই, কী লেখা আছে সেইটা জরুরি না, জরুরি হইল যা ঘটছে সেইটা।

ছোট একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে কায়সার–'আম্মা, তুমি রাগ করবে জানি, যে লোক আমার বাবাকে গুলি করে মেরেছে, সেই লোকের জন্য আমি কেন উতলা হব! কিন্তু এই তথ্য জানার আগেই আমি আর নাজিয়া দুজনকে ভালোবেসেছি। আর তুমিই আমাকে বারবার বলেছ ভালোবাসার দাম দিতে, বিশ্বাস নষ্ট না করতে। আমি আর নাজিয়া গেলাম। যখন ফিরে আসব, তখন তোমার রাগ থাকবে না জানি। আর যদি থাকেও, আমাদের দেখে সেই রাগ তোমার উবে যাবে। তুমি ভালো থেকো। দোয়া কোরো।'

এ রকম কিছু ঘটতেই পারে, জানা ছিল নাদিরা বেগমের। কিন্তু এমন কিছু ঘটার পথটা কিভাবে বন্ধ করতে হবে, জানা ছিল না তার। জানা ছিল না জায়নামাজে বসে আর বাকি সময় কায়সারের সঙ্গে আবোল-তাবোল গল্প করে কাটিয়েছে সে। কায়সার তার প্রস্তুতি কিছুই বুঝতে দেয়নি। সে কি রাগ করবে কায়সারের ওপর, তাকে না জানিয়ে নাজিয়াকে নিয়ে সে চলে গেছে বলে? জানিয়ে গেলে কী হতো? তার কি তখন কিছু বলার থাকত!

দড়ি জানতে চাইল–কী করব আম্মা? আপনে কী চান?

তোমারে তো কামরুলও খবর দিবে...।

না, ভাই খবর দিবে সার্কাসরে।

নাদিরা বেগম জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল–কামরুল কি এখন এরে

বেশি বিশ্বাস যায়?

ধরেন, যায়। যদিও এইখানে কেস ভিন্ন। কায়সার ভাইয়ের ঘটনা আমি জানি। সার্কাস জানে না।...আম্মা বলেন, আমি কী করব?

কী বলব দড়ি, বুঝি না।...খুঁইজা বাইর করো।

জি আম্মা।

ওদের আলাদা কইরা দাও।

জি আম্মা।

কিছু একটা করো দড়ি, কিছু একটা। আমি জানি না তুমি কী করবা, কিন্তু এই দুইজনের বিবাহ যে সম্ভব না, এইটা তো তুমি বোঝো?

দড়ি চুপ করে থাকল।

ধরো, মেয়েটারে তুমি গায়েব কইরা দিলা। কায়সারে বাসায় ফিরল। তারে আমি বিদেশ পাঠায়া দিব। কামরুল্লরে বলব নাজিয়ারে বিবাহ দিয়া দিতে।...দড়ি, আমি আসলে জানি না আমি কী করব।...সব কিছু এত সহজও না।

আম্মা, আমি যাইতেছি। আমার সব লোকরে নামায়া দিব।

শুধু বলবা তাদের আটকাইতে। বলতে বলতে বিষণ্ন হয়ে গেল নাদিরা বেগম। এই বিবাহ হয় না দড়ি। যদিও তাদের মানাইছিল খুব, কিন্তু এই বিবাহ হয় না। আপন হোক অথবা সৎ, ভাইবোনের বিবাহের কথা তুমি কখনো শুনছ?

আম্মা, আমি গেলাম।

যাও, শুনো। নাদিরা বেগমকে বিপর্যস্ত দেখাল। শুনো দড়ি, কায়সাররে আসল ঘটনা জানতে দিয়ো না। আমার দিকটাও দেইখো। সে একটা মিথ্যার মধ্যে আছে, সে সেই মিথ্যার মধ্যেই থাকুক।

সার্কাস খুবই ব্যস্ত। সে একের পর এক ফোন করে যাচ্ছে। আতিকুজ্জামান ও মাহমুদ তার দিকে তাকিয়ে আছে, যদিও সার্কাস কিছুটা দূরে বলে তার কোনো কথাই তারা শুনতে পাচ্ছে না। ইশারায় ডাকলে সার্কাস কাছে এসে দাঁড়াল। আতিকুজ্জামান জিজ্ঞেস করল–খবর পাইলা কোনো? শুধু ফোনই তো করতেছ!

ভাই, খবরের জন্যই ফোন করতেছি। একটু সময় তো দিবেন।

সার্কাস, তুমি বুঝতেছ না, হাতে সময় নাই। তারা বিবাহ করে ফেললে...।

আমার লোক তার আগেই তাগো খুঁইজা বাইর করব।

আমার মাইয়ার বয়স কম, তার বুদ্ধি কম। তারে নিরাপদে সরায়া আনবা।

আর ওই পোলারে টিকিট ধরায়া দিমু, এই তো?

ঠিক।

মাহমুদ গলা খাঁকারি দিল–আতিক ভাই, এইটা আপনে বারবার কী বলতেছেন!

কী বলতেছি?

টিকিট ধরায়া দেওয়ার কথা বলতেছেন। সে কে, এই বুঝ নাই আপনার?

তো কী বলব? আমার কাছে নিয়া আসার কথা বলব? তারপর তারে আমি কোলে নিয়া ঘুরব?

মাহমুদ তাকিয়ে থাকল আতিকুজ্জামানের দিকে, আতিকুজ্জামান বিরক্ত মুখে ফিরল সার্কাসের দিকে–ঠিক আছে, তারে টিকিট ধরায়া দেওনের দরকার নাই। কিন্তু দুইজনরে আলাদা করবা। বিবাহ করার সুযোগ দিবা না।

ভাই, ভাইবেন না, সার্কাস আছে।

আর বিবাহ যদি তারা কইরাও থাকে, কাগজপত্র ছিঁড়া ফালাবা। কাগজপত্র না থাকলে আবার কিসের বিবাহ! আতিকুজ্জামান মাহমুদের দিকে তাকাল–কাগজপত্র না থাকলে সেই বিবাহ কি বিবাহ?

মাহমুদ না-সূচক মাথা নাড়ল।

তুমি কি বাইর করতে পারছ নাজিয়া ক্যামনে কায়সারকে চেক পাঠাইল, ক্যামনে সে বাড়ি থেইকা পলাইল?

মাহমুদ আবারও না-সূচক মাথা নাড়ল।

বাইর করো। বাইর করতে না পারলে এই বাড়ি থেইকাই তোমার বাইর হওয়া বন্ধ, এইটা খেয়াল রাইখো।

মাহমুদের মুখ কালো হয়ে গেল।

আতিকুজ্জামান ফিরল সার্কাসের দিকে–খবর আসছে কুনো?

ভাই, আমার লোকজন ছড়ায়া পড়তেছে জায়গা মতো, খবর আইসা যাইব।...একটা কথা ছিল।

বলো।

এই কাজে কি আমি একা নামলাম, না দড়িরেও নামাইছেন?

দড়ি নামলে অসুবিধা আছে?

না, তা নাই...।

দড়ি নাই এই কাজে, তুমি একা।

দড়ি যদি ঝামেলা দ্যায় কী করব?

ঝামেলা দিব ক্যান!

সে লালবাগে গেছিল। রাতে গেছিল, একটু আগেও গেছিল...। ওই পোলার বাড়ি তো লালবাগ, না?

আতিকুজ্জামানকে খুবই বিরক্ত দেখাল–যাইতে পারে। ধরো, ওই পোলার মায়ে তারে চিনে। না, দড়ি ঝামেলা দিব না। আর যদি ঝামেলা দ্যায়, তোমার যা মনে লয় করবা।

জি।

'জি' বলে বের হয়ে এল সার্কাস। তার মুখে হাসি। ঝামেলা দিক আর না দিক, দড়ির নাম বাতিলের খাতায় তোলার একটা সুযোগ পাওয়া গেছে। তবে কাজটা কঠিন। দড়িকে ফেলা যতটা কঠিন, হয়তো দেখা গেল, সহজ মনে হলেও ওই দুজনকে খুঁজে বের করা আরো কঠিন। ভাবতে ভাবতে সার্কাসের মুখ গম্ভীর হলো, সে জানে, মানুষ যতটা সহজে ধরা দেয়, ততটা সহজে আবার উধাও-ও হয়ে যেতে পারে।

মাঙ্কি, তোমার ধারণা কী, পাওয়া যাইব?

দড়ি নাদিরা বেগমের ওখান থেকে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি। বসন্তকুমারকে সে বলেছে নির্দিষ্ট জায়গায় মাঙ্কিকে নিয়ে আসতে। আসার পর মাঙ্কিকে সে জিজ্ঞেস করল তুমি কি বলতে পারবা তোমারে ক্যান আনছি?

মাঙ্কি বলল–কিচকিচ।

ঠিক বলছ–কিচকিচ। যে খেলায় এহন আছি, সেইটা হইল মাঙ্কি মাঙ্কি খেলা, সেই খেলায় তোমার থাকা দরকার।

মাঙ্কি দড়ির কাঁধে উঠে বসল। দড়ি বলল–এইটা একটা ব্যাপার। যারা মাঙ্কি, তারা অন্যের কান্ধে উঠতে খুব পছন্দ করে।...চলো, কপালে কী আছে দেহি।

দড়ি জানে কাজটা সহজ। দুজন লোক উধাও হয়ে যাবে না। তারা থাকবে কোথাও না কোথাও, শুধু অনুমান করে সেই জায়গাটা বের করা। আবার দড়ি এও জানে, কাজটা কঠিন, দুজন লোক উধাও হয়ে যাবে না, তারা তাদের মতো থাকবে, কিন্তু তাদের পাওয়া যাবে না।

ফোন বাজল, দড়ি জিজ্ঞেস করল–কী খবর? পাইছ, না পাও নাই?

আবার ফোন বাজল, দড়ি আবার একই কথা জিজ্ঞেস করল।

আবার ফোন বাজল, দড়ি আবার একই কথা জিজ্ঞেস করল।

দড়ি বিরক্ত গলায় বলল–বারবার একই কথা জিগাইতে আর একই কথা শুনতে ভাল্ লাগে না। মাঙ্কি এইবার থেইকা তুমি ফোন রিসিভ করবা।...ধরো।

মাঙ্কি ফোন সেটটা নিল, এ-হাত ও-হাত করল, ফোন সেটে চুমু খেল, তারপর ছুড়ে দিল দূরে, ফোন সেটটা ড্রেনের ভেতর গিয়ে পড়ল।

এইটা একটা কাজ করলা! মাঙ্কি আমি এহন তোমারে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করব।

মাঙ্কি কিচ করে উঠল।

ওই যে, একটা লোক বলল, সে সব সময় মিথ্যা কথা বলে...।

মাঙ্কি আরো জোরে কিচকিচ করে উঠল।

আচ্ছা, ঠিক আছে, এইটা না। অন্য ধাঁধা, না ধাঁধা না, খেলা। ধরো, খেলা চলতেছে, দুইজন না জাইনা পলাইছে, আর যারা জানে তারা তাদের খুঁজতেছে–এহন কী হওয়া উচিত? খেলায় কে জিতল, যারা জানে না তারা, নাকি যারা জানে তারা?...বলো।

মাঙ্কি চুপ করে থাকল।

বলো।

মাঙ্কি হাত-পা ছুড়ে কিচমিচ করতে শুরু করে দিল।

খেপতেছ ক্যান!...কী বলতেছ? এই খেলার নিয়ম জানো না বইলা উত্তর দিতে পারবা না?...আচ্ছা। তবু ভাবো। সব খেলার নিয়ম নাই, মনে রাখো আর ভাবো। আমি অপেক্ষায় আছি।